সম্পূরক কৃষিশিক্ষা

নবম-দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম-দশম শ্রেণির সম্পূরক কৃষিশিক্ষা হিসেবে নির্ধারিত

সম্পূরক কৃষিশিক্ষা

নবম-দশম শ্রেণি

রচনা

মুহম্মদ নাসিম, ড. বিমল চন্দ্র কুন্ডু

ড. সৈয়দ নূরুল আলম, ড. মিয়া সাঈদ হাসান
মোঃ সাইফুল ইসলাম পাটোয়ারী, ড. একেএম শামীম আলম, মোঃ নাজমুল হাসান
ড. শাহ্ মোঃ জিকরুল হক চোধুরী, মোঃ আবুল কালাম আযাদ, প্রকৌশলী মোঃ লুৎফর রহমান
ড. মোঃ গোলজার হোসেন, ড. মোঃ খলিলুর রহমান, ড. জুবাইদা নাস্‌রীন আখতার
মোঃ রফিকুল ইসলাম, তৌহিদ মোঃ রাশেদ খান
মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক সংকলিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯–৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা–১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৮

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

বাংলাদেশ মূলত কৃষি-অর্থনীতি নির্ভর দেশ। একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করার জন্য অধিক ফসল ফলনের লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে সীমিত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি। কৃষি বিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বর্তমান কৃষি ক্ষেত্রে অনেক অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষির গুরুত্ব বৃদ্ধি এবং শিক্ষিত যুবসমাজকে আধুনিক কৃষির প্রতি আগ্রহী করার কৌশল নির্ধারনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বিদ্যমান পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি ৯ম-১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য **'সম্পূরক কৃষি শিক্ষা'** নামে পাঠ্যপুস্তকটি সংকলন করা হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক অত্র পাঠ্যপুস্তকটি সংকলন করা হয়েছে। আশা করা যায় এই পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদেরকে কৃষির তত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক উভয় দিকেই দক্ষ করে তোলার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সহায়তা করবে।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সংকলন, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	**কৃষি প্রযুক্তিঃ** ধান চাষ আলু উৎপাদন প্রযুক্তি ভাসমান বেডে ফসল চাষ প্রযুক্তি ফল ও সবজি উৎপাদনে উত্তম কৃষি পদ্ধতি (জিএপি)	১-২৫
দ্বিতীয়	**বালাই ব্যবস্থাপনা** সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম): প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ফেরোমন ফাঁদের মাধ্যমে পোকা দমন পদ্ধতি	২৬-৩১
তৃতীয়	**বাংলাদেশের ফল পরিচিতি** আম, লিচু, স্ট্রবেরি	৩২-৪৩
চতুর্থ	**মাটির স্বাস্থ্য**	৪৪-৪৬
পঞ্চম	**কৃষি উপকরণঃ** বীজ ও ক্ষুদ্র সেচ	৪৭-৫৫
ষষ্ঠ	**মৎস্য চাষঃ** মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা ধান ক্ষেতে মাছ চাষ পেনে মাছ চাষ	৫৬-৭২
সপ্তম	**গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন** গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগি পালন গবাদিপশুর রোগ পরিচিতি ও প্রতিকার	৭৩-৮৭
অষ্টম	**শাকসবজি ও ফলের আধুনিক উৎপাদন ও রপ্তানি**	৮৮-৯২
নবম	**কৃষি বিপণন**	৯৩-১০০
দশম	**কৃষিবিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা পরিচিতি**	১০১-১০২

প্রথম অধ্যায়
কৃষি প্রযুক্তি

ধান চাষ

ধান একটি আংশিক জলজ উদ্ভিদ। যেখানে জলাভূমি বা পানির আধিক্য বেশি সেখানে ধানের বিস্তৃতি বেশি। বাংলাদেশের সর্বত্র নদী-নালা, বিল-হাওর-বাঁওড় ছড়িয়ে রয়েছে, যাতে রয়েছে প্রচুর পানি। বছরের অর্ধেক সময় এদেশে প্রচুর বৃষ্টি হয় এবং এ সময় উজান দেশ থেকে নেমে আসে অঢেল বন্যার পানি। বছরের বাকি অর্ধেক সময় অর্থাৎ খরা মৌসুমে ভূ-উপরিস্থিত বা ভূগর্ভস্থ পানি দিয়ে সহজেই ক্ষেতে সেচ দেওয়া যায়। পানির এ সহজলভ্যতার কারণে এদেশে সর্বত্র বিস্তৃত রয়েছে ধানের আবাদ। ধান এদেশের প্রধান ফসল।

ধানের পুষ্টিমান

ধান বাঙালির প্রধান খাদ্য। ধান মূলত শর্করা নামক পুষ্টি সরবরাহ করে যা আমাদের শরীরে তাপ তথা শক্তি উৎপাদন করে। আবহমান কাল ধরেই আমরা তিন বেলা ভাত খাই। ফলে বাঙালি জাতির মূল শারীরিক শক্তির উৎস হলো ধান। এছাড়া ধানে রয়েছে প্রায় ৭% আমিষ, কিছু স্নেহ, ভিটামিন বি ও ভিটামিন ই এবং বিভিন্ন খনিজ পদার্থ। আমরা পেট পুরে ভাত খাওয়ার চেষ্টা করি বিধায় আমাদের শরীরের আমিষের বড় অংশ ভাত থেকে আসে। আমাদের শরীরের প্রধান দুইটি পুষ্টি উপাদানের উৎসই হলো ধান।

ধানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব

ধান কেবল একটি শস্যই নয়, ধান আমাদের জীবন। প্রধান খাদ্য হিসেবে ধান আমাদের পুষ্টি সাধন করে। এছাড়াও আমাদের জীবিকায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে ধানের রয়েছে বিরাট ভূমিকা। আমাদের সংস্কৃতির একটি বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে ধান। আবহমান বাংলার নবান্ন একটি অন্যতম উৎসব। শীতের শুরুতে আমন মৌসুমের ধান উঠে। ধানের গোলা পূর্ণ থাকায় মানুষের মন এই সময় উৎসবে মেতে উঠে। তাই এ সময় ঘরে ঘরে পিঠা-পায়েস রান্না হয়। সবাই আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে যায়। ধান থেকে প্রাপ্ত সম্পদের প্রাচুর্যে গ্রামে গ্রামে চলে মেলা, জারি-সারি গান। নববর্ষের অনুষ্ঠানে থাকে চাল থেকে তৈরি খাদ্যের প্রাচুর্য্য। সামাজিক, ধর্মীয় ও অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হয় সুগন্ধি চাল। আমাদের প্রাত্যহিক খাবার থেকে উৎসবের সকল খাবারের মধ্যমণি এই চাল। ধান থেকে তৈরি হয় হরেক রকমের খাবার। ভাত, খিচুরি, পোলাও, বিরিয়ানি, খির, পায়েস, শত রকমের পিঠা, মুড়ি, চিড়া, খই, মোয়া আরও কত কী!

এদেশের বিরাট সংখ্যক মানুষ কৃষিজীবী। দেশের ৭৫% জমিতে ধান হয়, তাই ধান চাষই কৃষিজীবীদের মূল পেশা। দেশের অসংখ্য মানুষের জীবিকার উৎস ধান। ধান উৎপাদনে বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার হয়, যেমন-ধান বীজ, সার, পানি, বালাইনাশক ইত্যাদি। ধান চাষে ব্যবহার করা হয় অনেক কৃষি যন্ত্রপাতি। সমস্ত দেশের ধান

ক্ষেতের জন্য এ সকল উপকরণ ও যন্ত্রপাতি উৎপাদন ও সরবরাহ করা একটি বিরাট অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। ধানের পরিচর্যা এবং কর্তনোত্তর প্রক্রিয়াজাতকরণ বিরাট একটি কর্মকাণ্ড। চাতালে ধান শুকানো, মাড়াই কালে মাড়াই করা, বস্তা ও প্যাকেটজাত করে সারা দেশে ভোক্তার জন্য সরবরাহ করায় রয়েছে এক বিরাট অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, যার সাথে এদেশের অসংখ্য মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। তাই বলা হয়ে থাকে ধানই আমাদের জীবন। অন্যদিকে ধান থেকে প্রাপ্ত উপজাতের বহুল ব্যবহার রয়েছে। যেমন- খড় গোখাদ্য, জ্বালানি বা ঘর ছাওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়, তুষ জ্বালানি কাজে ব্যবহৃত হয়, কুড়া থেকে হয় মুরগি বা মাছের খাবার। ইদানীং কুড়া থেকে তৈরি হচ্ছে উৎকৃষ্টমানের ভোজ্যতেল।

পরিবেশের সাথে ধানের অভিযোজন

ধান পানি পছন্দকারী একটি উদ্ভিদ। সফলভাবে ধান চাষ করতে গেলে এর জীবদ্দশায় প্রচুর পানির প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এই পানিকে কাজে লাগিয়ে রোপা আমন ধান চাষ করা হয়। বর্ষাকালে দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল উজান থেকে নেমে আসা বন্যার পানিতে তলিয়ে যায়। এই বন্যার পানির মধ্যে চাষ করা হয় জলি আমন ধান। এভাবে মৌসুমি বৃষ্টি ও বন্যার পানিকে কাজে লাগিয়ে বছরের অর্ধেক সময় ধান চাষ করা হয়। বৃষ্টি ও বন্যার পানি আবার মাটির ভিতর দিয়ে চুইয়ে গিয়ে মাটির কোনো কঠিন অপ্রবেশ্য স্তরের উপর জমা হয়। পাম্প দিয়ে ভূগর্ভস্থ এ পানি তুলে বৃষ্টিবিহীন শীত ও গ্রীষ্মকালে ধান চাষ করা যায়। এছাড়াও এ সময়ে নদী-নালা, খাল-বিল থেকে পানি তুলে এনেও সেচকাজে লাগানো যায়। মূলত দেশের নিম্নাঞ্চলে যেখানে নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় রয়েছে বা যেখানে বন্যার পানি আসে, এসব অঞ্চলে সারা বছর ধান চাষ করা যায়। পানি যেখানে বেশি সেখানে এ রকমভাবে অন্য কোনো শস্য চাষ করা যায় না। এ সকল নিম্নাঞ্চলে বন্যার সময় প্রচুর পলি পড়ে মাটিকে উর্বর করে তোলে। তাই ভূগর্ভস্থ পানি বা খাল-বিলের পানি ব্যবহার করে এখানে ধান চাষ করে অধিক ফলন পাওয়া যায়। তবে কেবল নিচু জমিই নয় উঁচু জমিতেও আমাদের দেশে প্রচুর ধান চাষ করা হয়। সেখানে মূলত বৃষ্টির পানিকে কাজে লাগানো হয়। যেমন- পাহাড়ের ঢালে। এখানে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী জুম চাষের মাধ্যমে এক ধরনের ধান আবাদ করে। পাহাড়ের ঢাল খরাপ্রবণ এবং সেখানে বৃষ্টির পানি আটকায় না। এই জুমে বর্ষার বৃষ্টি শুরু হওয়ার সময় ধান বুনে দেওয়া হয়। পরে মৌসুমি বৃষ্টির পানি দিয়েও ধান চাষ করা হয়। এছাড়া সমতলে সম্পূর্ণ মৌসুমি বৃষ্টির পানিকে কাজে লাগিয়েও ধান চাষ করা যায়।

আমাদের দেশে বছরে তিনটি মৌসুমে ধান চাষ করা হয়। এ তিনটি মৌসুমের নাম হলো আউশ, আমন ও বোরো। বছরের প্রথম দিকের বৃষ্টিকে কাজে লাগিয়ে যে ধান এপ্রিল-মে মাসে চাষ করা হয় তাকে বলে আউশ ধান। তবে বর্তমানে এ ধানটি সেচ দিয়েই মূলত আবাদ শুরু করা হয়। আউশ শব্দটি এসেছে আশু বা আগাম শব্দ থেকে। অর্থাৎ পরবর্তী আমনের আগে আশু হিসেবে এটি চাষ করা হয়। আউশ ধানে প্রথম দিকে বৃষ্টিপাত থাকে না বলে এর খরা সহিষ্ণুতা এবং সেই সাথে এ সময় এ দেশে তাপমাত্রা উচ্চ থাকে বলে এর উচ্চ তাপ সহনশীলতা থাকে। তবে জীবনকালের শেষের দিকে আউশ ধান প্রচুর বৃষ্টিপাত পায়। এ ধান জুলাই-আগস্ট মাসে কাটা হয়। আউশ ধান সরাসরি বপন বা চারা রোপণের মাধ্যমে চাষ করা হয়। এ ধানের জীবনকাল কিছুটা কম হয়।

আউশ ধানের পর আমন ধান চাষ করা হয়। আমন শব্দটি এসেছে 'আমান' আরবি শব্দ থেকে যার অর্থ নিশ্চিত। আবহমান কাল ধরে মৌসুমি বৃষ্টির উপর নির্ভর করে এ ধান চাষ করা হয়। বর্ষার সময় বৃষ্টিপাত নিশ্চিত। তাই সহজভাবে আমন চাষ করা যায়। আমন ধান প্রচুর বৃষ্টিপাতের সময় আবাদ হয় বলে এ ধান বৃষ্টিনির্ভর। বৃষ্টিপাত যখন বন্ধ হয় তখন এ ধান ফুল-ফল দিয়ে পেকে যায়। আমন মৌসুমের ধান রোপা আমন বা জলি আমন ধান হতে পারে। রোপা আমন ধানের চারা উৎপাদন জুন মাসের মাঝামাঝিতে শুরু হয়। অবস্থাভেদে ২০ থেকে ৫০ দিনের চারা জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত রোপণ করা হয়। রোপা আমন অঞ্চলভেদে নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ে কর্তন করা যায়। অন্যদিকে জলি আমন ধান বন্যাপ্রবণ এলাকায় বন্যার পানি আসার আগে সাধারণত এপ্রিল মাসে বপন করা হয়। বন্যার পানি সরে গেলে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ধান কাটা হয়।

বোরো ধান হয় শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালজুড়ে। বাঁওড় শব্দটি থেকে বোরো ধান এসেছে। হাওড়-বাঁওড়ে আবহমান কাল ধরে এ ধানটি চাষ হয় বলে একে বোরো ধান বলে। এ সময় সারা দেশের পানি শুকিয়ে যায় কেবল হাওর-বাঁওড়-বিলে পানি থাকে। তাই এসব অঞ্চলে বোরো ধান ভালো হয়। তবে বর্তমানে এ ধান উঁচু, মধ্যম উঁচু ও নিচু জমিতেও সেচ দিয়ে চাষাবাদ করা হয়। বোরো ধান নিম্ন তাপমাত্রা সহিষ্ণু। বোরো ধানের চারা নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে তৈরি করা হয় এবং জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে রোপণ করা হয় এবং এপ্রিল-মে মাসে কর্তন করা হয়।

উপরোক্ত ধানের এই তিনটি মৌসুম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ধান বাংলাদেশে সারা বছরই চাষ করা যায়। অন্য কোনো শস্য সারা বছর এমন করে আবাদ করা যায় না। এ জন্য এদেশে ধানের আবাদ এত বেশি।

এদিকে বাংলাদেশের সর্বত্র ধান চাষ করা যায়। বাংলাদেশের রয়েছে পাহাড়, রয়েছে সমভূমি, রয়েছে অতি নিচু জমি। এর সর্বত্রই ধান চাষ হয়। আর মাটির ধরন বিবেচনা করলে দেখা যায় এদেশে রয়েছে উৎকৃষ্ট মানের পলল জমি, রয়েছে আদি সময়ে গড়ে উঠা মধুপুর গড় বা বরেন্দ্র ভূমি, রয়েছে লবণাক্ত জমি, রয়েছে বন্যাকবলিত অঞ্চল, রয়েছে জোয়ার-ভাটাকবলিত অঞ্চল, সর্বত্রই ধান চাষ করা যায়। অন্যদিকে এ ধান সারা বছরই আবাদ করা যায় বলে কোনো অঞ্চলে এক মৌসুমে ধান না হলেও অন্য মৌসুমে ধান আবাদ করা যায়। এভাবে দেশের সর্বত্রই ধান চাষ হয়। যদিও হিসাব করলে দেখা যাবে এদেশে দুই শতাধিক শস্যের চাষ হয়, তবু এদেশে গড়ে ৭৫% জমিতে ধান হয়। বাকি সকল শস্য হয় বাকি ২৫% জমিতে।

বাংলাদেশে অনেক পরিবেশ রয়েছে যা শস্য চাষের জন্য কিছুটা প্রতিকূল। তবে ঐ সকল অঞ্চলে ধান সুন্দরভাবে অভিযোজন করে নিয়েছে। উপযুক্ত ধানের জাত এবং বিশেষায়িত কিছু উৎপাদন ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করে এ সকল অঞ্চলে সফলভাবে ধান চাষ করা যায়। বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বর্ষাকালে বন্যা হয়। বন্যায় মাঠের পর মাঠ পানিতে তলিয়ে যায়। অনেক অঞ্চলে ১-৩ মাস পর্যন্ত ১-৩ মিটার পর্যন্ত বন্যার পানিতে ডুবে থাকে। প্রথমে শুকনো ক্ষেতে বন্যার পানি আসে, পরে ধীরে ধীরে এ পানির উচ্চতা বাড়ে। বন্যাকবলিত এ সকল অঞ্চলে তেমন কোনো শস্য চাষ করার কথা চিন্তাই করা যায় না। তবে এখানে জলি আমন ধান সফলভাবে চাষ করা যায়। বন্যার পানি আসার পূর্বে এ ধান বপন করা হয়। পরে বন্যার পানি এলে পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে এ ধানের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। ফলে ধান গাছ পানিতে সম্পূর্ণ তলিয়ে যায় না। পরে বন্যার

পানি সরে গেলে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে এ ধান কাটা হয়। এভাবে এ জাত ব্যবহার করে এখানে সফলভাবে ধানের আবাদ করা যায়।

দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে জোয়ার-ভাটা হয়। জোয়ারের সময় নদী দিয়ে পানি উপরে উঠে আসে এবং ভাটার সময় পানি নেমে যায়। বর্ষার সময় জোয়ারের পানির এ উঠানামায় অধিক পরিমাণে পানি আসে এবং যায়; যার ফলে ক্ষেতে এ সময় কোনো শস্য চাষ করা যায় না কারণ শস্য জোয়ারের সময় পানিতে তলিয়ে যায় এবং বেশির ভাগ শস্য এত পানি সহ্য করতে পারে না। তবে এখানে সফলভাবে আমন মৌসুমে উপযুক্ত জাতের ধান চাষ করা যায়। এ সকল অঞ্চলে যে সকল ধানের জাত ব্যবহার করা হয় তার চারা বীজতলায় খুব দ্রুত বাড়ে, চারা খুব লম্বা হয় এবং কাণ্ড খুব শক্ত হয়। ফলে এ চারা রোপণ করলে জোয়ারের পানিতে চারা তেমন তলিয়ে যায় না বা জোয়ারের পানির টানে এর তেমন ক্ষতি হয় না। তাই জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে এ ধান সহজে চাষ করা যায়।

সাগরের নিকটবর্তী জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে লবণাক্ত পানি উঠে আসে। লবণাক্ততা শস্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। লবণাক্ততার কারণে এ সকল অঞ্চলে বিভিন্ন শস্য চাষ করা যায় না। ধানের অনেক জাতের মধ্যে লবণাক্ত সহিষ্ণুতা রয়েছে। এ সকল জাত এ সকল অঞ্চলে সফলভাবে চাষ করা যায়।

হঠাৎ করে বেশি বৃষ্টিপাত হলে রোপা আমন ধান পানিতে তলিয়ে যায়। ধান ৬/৭ দিন পানির নিচে থাকলে গাছ মারা যায়। এ অবস্থায় অন্য শস্য তো আবাদই করা যায় না। তবে আকস্মিক বন্যা সহিষ্ণু রোপা আমন জাত চাষ করলে ১৪/১৫ দিন ডুবে থাকা ধান গাছ থেকে তুলনামূলকভাবে ভালো ফলন পাওয়া যায়।

পাহাড়ের ঢালে জুমে ধান চাষের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। জুমে উপযুক্ত ধানের জাত ব্যবহার করে এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠী তাদের ধানের চাহিদা পূরণ করে।

পরিবেশের সাথে ধানের এ ধরনের অনেক অভিযোজন ক্ষমতা রয়েছে। তাই বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ধান চাষ হয়।

ধান গাছের প্রজাতি, অঙ্গসংস্থান, বৃদ্ধি ও ক্রমবিকাশ

ধানের Family হলো- Poaceae, Subfamily হলো Oryzoideae এবং Genus হলো Oryza । Oryza এর দুইটা Species চাষ করা হয়। একটি *Oryza sativa* অন্যটি *O. glaberrima*। শেষোক্ত Speciesটি কেবল আফ্রিকা অঞ্চলে চাষাবাদ করা হয়। *Oryza sativa*-এর তিনটি Geographical race রয়েছে। Japonica, Javanica এবং Indica। ইন্ডিকা ধান এ উপমহাদেশ তথা আমাদের দেশে চাষাবাদ হয়ে থাকে।

ধান গাছের জীবনচক্র তিনটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করা যায়, যথা- (১) দৈহিক বর্ধনশীল পর্যায়, (২) প্রজনন পর্যায় এবং (৩) পরিপক্ক পর্যায়।

দৈহিক বর্ধনশীল পর্যায়: বীজ অঙ্কুরোদগমন স্তর থেকে কাইচথোড় বের হওয়া পর্যন্ত সময়। কাণ্ডের সর্বশেষ গিঁটের উপর ডিগ পাতার খোলের ভিতর যখন থোড়ের সৃষ্টি হয় এবং থোড় খুব ছোট থাকে তখন তাকে কাইচথোড় বলে।

প্রজনন পর্যায়: কাইচথোড় থেকে ফুল ফোটা পর্যন্ত সময়কে প্রজনন পর্যায় বলে।

পরিপক্ক পর্যায়: ফুল ফোটার পর থেকে পরিপূর্ণ ধান পাকা অবস্থা পর্যন্ত সময়কে পরিপক্ক পর্যায় বলে।

অধিকাংশ ধান জাতের জীবনকাল ৩-৬ মাসের মধ্যে হয়ে থাকে। আমাদের দেশে অল্প কিছু ধান আছে যার জীবনকাল এর চেয়ে কম বা বেশি হতে দেখা যায়।

ধান গাছ একটি খাড়া, গোলাকার ফাঁপা কাণ্ডবিশিষ্ট, লম্বা, সরু ও চ্যাপটা মসৃণ কুশি উৎপাদনকারী ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ। ধান গাছের বর্ধনশীল অংশ শিকড়, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত। পুষ্পের অংশে রয়েছে শিষ ও দানা। ধানের ফুল মঞ্জুরিকে স্পাইকলেট বলে। এটি দুইটি পুষ্প মঞ্জুরিপত্র দিয়ে ঢাকা থাকে, যাকে তুষ বলে। ধানের দানায় তুষের নিচে লালচে রঙের একটি পাতলা আবরণ থাকে, যাকে কুঁড়া বলে। পরিপক্ক ধানের তুষ এবং কুঁড়ার অভ্যন্তরে শর্করা দিয়ে তৈরি বড় অংশটিকে এন্ডোসপার্ম বলে, যা মূলত চাল।

ধান চাষে আবহাওয়ার ভূমিকা

বাংলাদেশের আবহাওয়া উচ্চ বৃষ্টিপাত ও উচ্চ তাপমাত্রাসমৃদ্ধ। এ ছাড়াও সূর্যের আলো ও দিবা দৈর্ঘ্য এখানে বছরব্যাপী পরিবর্তনশীল। এদেশে জুন থেকে অক্টোবর মাসে মৌসুমি বৃষ্টিপাত হয় এবং এ সময় এদেশের ৮০% বৃষ্টিপাত শেষ হয়ে যায়। বৃষ্টি ধানের চারা গজানো বা চারা রোপণকে এবং সেই সাথে জীবনকালকে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশে মৌসুমভেদে উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রা বিরাজ করে। সাধারণভাবে ২০° সে. থেকে ৩৫° সে. তাপমাত্রা ধানের বিভিন্ন বৃদ্ধি পর্যায়ে কোনো ক্ষতি করে না। তবে এর চেয়ে নিম্ন ও উচ্চ তাপমাত্রা আমাদের দেশে বিরাজ করে। তাই আউশ, আমন ও বোরো ধান সঠিক সময় আবাদ করলে ঐ সকল নিম্ন ও উচ্চ তাপমাত্রা ধানের বিভিন্ন বৃদ্ধি পর্যায় যেমন- অঙ্কুরোদগম, চারা উৎপন্ন হওয়া, কুশি হওয়া, ছড়া উৎপন্ন হওয়া, পরাগায়ন হওয়া, ধান পাকা ইত্যাদি পর্যায়কে ব্যাহত করতে পারে না। সূর্যালোক ধানের জন্য অত্যন্ত জরুরি। তাই মেঘমুক্ত আকাশ থাকায় বোরো মৌসুমে ফলন বাড়ে, অন্যদিকে আকাশে মেঘ থাকায় আমন মৌসুমে ফলন কমে। কারণ সূর্যালোক সালোক সংশ্লেষণে সহায়তা করে।

ধানের জাত

উচ্চ ফলনশীল (উফশী) বা আধুনিক জাতের আবিষ্কারের পূর্বে আবহমান কাল ধরে এদেশে যে সকল ধানের জাত আবাদ করা হতো তাদের বলা হয় দেশি বা স্থানীয় জাত। এ সময় এ দেশে ১০,০০০ এর চেয়ে বেশি স্থানীয় জাত আবাদ করা হতো বলে মনে করা হয়। বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক পরিবেশে ধানের জিনের মধ্যে পরিবর্তন হয়ে বা প্রাকৃতিকভাবে পরপরাগায়ন হয়ে এবং পরে কৃষক কর্তৃক বাছাই হয়ে হাজার হাজার স্থানীয় জাত তৈরি হয়েছে। স্থানীয় জাতের বৈশিষ্ট্য হলো- এ জাতগুলো লম্বা হয়, পাতা সরু হয়, পাতা হেলে পড়ে, পাতা চিকন হয় এবং এতে কুশি কম হয়। এর কাণ্ড দুর্বল এবং গাছ বড় হয়ে নুইয়ে পড়ে। স্থানীয় জাতের ফলন কম।

চিত্রঃ উফশী ধানের জাত

কৃত্রিম সংকরায়ণের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করা হয়। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে এ সকল জাত উদ্ভাবন করা হয়। এ সকল জাতের বৈশিষ্ট্য হলো এরা খর্বাকৃতির, এদের পাতা চওড়া এবং খাড়া, এদের কুশি বেশি, ধান পাকলেও গাছ অনেকটা সবুজ থাকে এবং পাতা এবং এর কাণ্ড নুইয়ে পড়ে না। এদের ফলন বেশি। উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত আবার দুই ধরনের হতে পারে। একটিকে বলা হয় ইনব্রিড, অন্যটিকে বলা হয় হাইব্রিড।

ইনব্রিড ধানঃ দুইটি জাতের ধানের ফুলের মধ্যে একটির পুংকেশর এবং অন্যটির গর্ভকেশরের মধ্যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় পরাগায়ন করে কৃত্রিম সংকরায়ণের মাধ্যমে যে গাছ পাওয়া যায় তাকে বলা হয় F_1 বংশধর। F_1 সংকেতটি First filiam generation বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। বাংলায় যার অর্থ হচ্ছে প্রথম প্রজন্ম। এই F_1 গাছ সর্বদা একরকম থাকে। কিন্তু এই F_1 গাছ থেকে যখন পরবর্তী বংশধরের গাছ লাগানো হয় তখন সকল গাছের বৈশিষ্ট্য এক থাকে না। এ সকল গাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত গাছ বাছাই করা হয়। এই প্রক্রিয়া F_6 বংশধর পর্যন্ত চললে যে গাছ পাওয়া যায় তা থেকে প্রাপ্ত গাছ সব সময় একই বৈশিষ্ট্যের হয়। এই একই এবং উপযুক্ত বৈশিষ্ট্যওয়ালা গাছকে জাত হিসেবে অবমুক্ত করা হয় যাকে ইনব্রিড জাত বলে। ইনব্রিড জাতের বীজ থেকে ঐ একই ইনব্রিড জাত পাওয়া যায়। ইনব্রিড জাত অবমুক্ত করতে সাধারণত ১৩/১৪ বছর সময় লাগে। এখানে উল্লেখ্য, সকল স্থানীয় জাতও ইনব্রিড জাত।

চিত্রঃ স্থানীয় ধানের জাত

হাইব্রিডঃ কৃত্রিম সংকরায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত F_1 বংশধরের গাছকে যখন জাত হিসেবে অবমুক্ত করা হয় তখন তাকে হাইব্রিড জাত বলে। হাইব্রিডের জাত সাধারণত ইনব্রিডের চেয়ে ফলন বেশি দেয়। হাইব্রিড ধানের জাত থেকে বীজ রেখে তা পরবর্তী বংশ ব্যবহার করলে আগের প্রজন্মের মতো একই বৈশিষ্ট্যের গাছ পাওয়া

যায় না এবং এতে ফলন অত্যন্ত কমে যায়। তাই হাইব্রিড ধানের বীজ কৃষক পর্যায়ে রাখা যায় না। প্রতিবার হাইব্রিড কোম্পানি থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হয়।

আধুনিককালে আরও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে Transgenic rice বা Genetically modified ধানের জাত উদ্ভাবন করা হচ্ছে। কোনো একটি ভালো ধানের জাতে দূরবর্তী কোনো প্রজাতি যথা অন্য কোনো গাছ বা প্রাণী থেকে যখন কোনো জিন এনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তখন যে ধানের জাত তৈরি হয় তাকে ট্রান্সজেনিক বা জেনেটিক্যালি মডিফাইড ধানের জাত বলে। IRRI তে উদ্ভাবিত Golden rice এ ধরনের ধানের জাত। এ জাতে ভিটামিন এ এর জিন ঢোকানো হয়েছে। এ জিন ধানে পাওয়া যায় না। এ জিন ঢোকানোর ফলে ধান গাছে ভিটামিন এ উৎপন্ন হতে পারছে।

ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি

ধান চাষাবাদের বেশ কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। তার মধ্যে সরাসরি বীজ বপন এবং চারা রোপণ দুইটি মূল পদ্ধতি। সরাসরি বীজ বপন পদ্ধতিতে জমি তৈরি করে তাতে বীজ সরাসরি বপন করা হয়। বীজ সারিতে বপন করা যায় বা ছিটিয়ে দেওয়া যায়। জমি তৈরির ক্ষেত্রে জমি শুকনা অবস্থায় তৈরি করে জমিতে জো থাকা অবস্থায় বীজ বপন করা যায় অথবা জমি কাদা করে তৈরি করে তাতে বীজ বপন করা যায়।

ধান চাষের অন্য পদ্ধতি হলো চারা রোপণ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে বীজতলায় প্রথমে চারা উৎপাদন করা হয়। সেই চারা তুলে এনে কাদা করে জমি তৈরি করে চারা রোপণ করা হয়। রোপণ সাধারণত সারিতে করা হয়। জমি কাদা করে তৈরি করতে সেচ ও বৃষ্টির পানি ব্যবহার করা হয়। বোরো মৌসুমে সেচ এবং আমন মৌসুমে বৃষ্টির পানি ব্যবহার করা হয়। আউশের চারা রোপণে সাধারণত সেচের পানি, তবে অনেক স্থানে বৃষ্টির পানিও ব্যবহার করা হয়।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি

মৌসুম

ধান চাষের তিনটি মৌসুমের কথা ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি মৌসুমে সঠিক সময়ে ধান আবাদ শুরু করলে অযাচিত উচ্চ বা নিম্ন তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাতের তারতম্য, বন্যা, বা ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া ইত্যাদি সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তবে আবহাওয়া, প্রাকৃতিক পরিবেশ, শস্য বিন্যাস ইত্যাদি কারণে মৌসুমের মধ্যে ধানের আবাদ আগাম বা দেরি হতে পারে, যেমন- দেরিতে বৃষ্টিপাত হলে রোপা আউশ বা রোপা আমনের বীজতলা বা চারা রোপণ দেরি হতে পারে। যে পরিবেশে অল্প বন্যা হয় সেখানে বন্যার পানি নামার পর রোপা আমন নাবিতে আবাদ করা হয়। একই জমিতে বছরে পর্যায়ক্রমে যে যে শস্য আবাদ করা হয় তাকে শস্যক্রম বলে। দেশের উত্তরাঞ্চলে অনেক শস্যক্রমে রবি মৌসুমে আলু চাষ করে বোরো ধান আবাদ করা হয়। এতে বোরো চাষ বিলম্বিত হয়।

বীজ বপন

বীজ বপন চাষাবাদ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। সরাসরি বীজ বপনের ক্ষেত্রে তৈরি জমিতে অঙ্কুরিত বা অ-অঙ্কুরিত বীজ সারিতে বা ছিটিয়ে বপন করা হয়। শুকনা চাষে বীজ সাধারণত অ-অঙ্কুরিত থাকে এবং বীজ ছিটানোর পর তা মই দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। চারা রোপণের ক্ষেত্রে বীজতলা তৈরি করে তাতে বীজ ফেলা হয়। বিভিন্ন ধরনের বীজতলা হতে পারে। তবে দেশে সাধারণত ভেজা বীজতলা তৈরি করা হয়। এতে সাধারণত জমি কাদাময় করে তৈরি করে অঙ্কুরিত বীজ বীজতলায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়। বীজের হার চাষাবাদ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। এছাড়াও মৌসুম, বপন-রোপণের সময় অর্থাৎ আগাম না নাবি, বীজের ওজন ইত্যাদির উপর বীজের হার নির্ভর করে। চারা রোপণের ক্ষেত্রে হেক্টরপ্রতি ২০-৩০ কেজি বীজ ব্যবহার করা হয়। বীজতলায় ৮০-১০০টি ধান প্রতি মিটারে ফেলা হয়। সরাসরি বপনের ক্ষেত্রে বেশি বীজ লাগে। এক্ষেত্রে হেক্টরপ্রতি ৫০-৭০ কেজি বীজ ব্যবহার করা হয়।

জমি প্রস্তুতকরণ

সরাসরি বীজ বপনের জন্য জমি ৩-৫ বার মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করে তৈরি করা হয়। এভাবে চাষ ও মই দিলে মাটি ঝুরঝুরে হয় এবং ক্ষেতে থাকা আগাছা বাছাই করে নেওয়া যায়।

চারা রোপণের জন্য জমি কাদাময় করে তৈরি করা হয়। মাটির প্রকারভেদে জমিতে প্রয়োজনমতো পানি দিয়ে ৩-৪টি চাষ ও মই দিয়ে থকথকে করে কাদাময় জমি তৈরি করা হয়। চাষের মাঝে কিছুদিন জমি ফেলে রাখলে আগাছা পচে জমি আগাছামুক্ত হয়।

শুকনো বা কাদাময় জমি তৈরির সময় জমি যাতে সমতল হয় সে দিকে লক্ষ রাখতে হয়। শেষ চাষ বা মই-এর সময় জমিতে অনুমোদিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হয়।

চারা রোপণ সাধারণভাবে আউশে ২০-২৫, বোনা আমনে ২৫-৩০ এবং বোরোতে ৩৫-৪৫ দিনের চারা রোপণ করা হয়। রোপণের সময় জমিতে ছিপছিপে পানি রাখা দরকার। প্রতি গুছিতে একটি করে সতেজ চারা রোপণ করলেই চলে। গুছিতে একটি চারা রোপণ করলে প্রতি হেক্টরে ৮-১০ কেজি বীজ প্রয়োজন হয়। তবে গুছিতে ২-৩টি চারাও রোপণ করা যায়। এতে সে অনুপাতে বীজের হার বেড়ে যাবে। মাটির ২-৩ সে.মি. গভীরে চারা রোপণ করা প্রয়োজন। বেশি গভীরে চারা রোপণ করলে এর বাড়-বাড়তি এবং কুশির সংখ্যা কিছুটা কমে যায়। চারা সারিতে রোপণ করা উচিত। সাধারণত সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০-২৫ সে.মি. এবং প্রতি সারিতে গুছি থেকে গুছির দূরত্ব ১৫-২০ সে.মি. হতে পারে।

সার ব্যবস্থাপনা

উফশী ধান থেকে ভালো ফলন পেতে হলে মাটিতে সার প্রয়োগ করা অতি আবশ্যক। উফশী ধান ভালো ফলন পাওয়ার জন্য মাটিতে যে পরিমাণ খাদ্য উপাদান থাকা দরকার তা থাকে না বিধায় সার প্রয়োগ করা জরুরি। এছাড়া কিছু কিছু মাটিতে দুই-একটি খাদ্য উপাদানের ঘাটতি থাকলে ঐ খাদ্য উপাদানও সার হিসেবে প্রয়োগ করা দরকার। সার প্রয়োগের জন্য বেশ কিছু বিষয় বিবেচনা করা হয়। এর মধ্যে মাটির উর্বরতা, ধানের কাঙ্ক্ষিত ফলন, আবহাওয়া, জাত, শস্যক্রম, জীবনকাল, চাষাবাদ পদ্ধতি ইত্যাদি। এ সব বিষয় বিবেচনা করে সারের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। আমাদের দেশে ধান চাষের জন্য পাঁচটি সারের প্রয়োজন হয়। এ পাঁচটি সারের মূল উপাদান হলো নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, সালফার বা গন্ধক ও জিংক বা দস্তা। এ সকল খাদ্য উপাদানওয়ালা সার বাজারে ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম ও দস্তা সার নামে পাওয়া যায়। উল্লিখিত বিষয় বিবেচনা করে এ সকল সারের মাত্রা নির্ণয় করা হয়। অনেক বিষয়ের উপর সারের মাত্রা নির্ভর করে বলে ধান চাষে কোনো নির্দিষ্ট মাত্রা উল্লেখ করা যায় না। তবে উফশী ধানে গড়ে বোরো, রোপা আমন ও আউশ মৌসুমে যথাক্রমে ৩৫-১২-২০-১৫-১.৫, ২৬-৮-১৪-৯-০ ও ১৮-৭-১১-০-০ কেজি ইউরিয়া-টিএসপি-এমওপি-জিপসাম-দস্তা সার প্রয়োগ করা যায়। সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করা অতি জরুরি। তা না হলে ফলন কমে যায় এবং জমির উর্বরতা হ্রাস পায়। এছাড়াও ভালো ফলন পাওয়ার জন্য উল্লিখিত রাসায়নিক সারের সাথে সাথে মাটিতে জৈবসার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। জৈবসার হিসেবে পচা গোবর, আবর্জনা পচা সার, মুরগির বিষ্ঠা, সবুজ সার ব্যবহার করা যেতে পারে। বিভিন্ন সার ভিন্ন ভিন্নভাবে মাটিতে মিশে, গলে গিয়ে গাছের আহরণযোগ্য মূল খাদ্য উপাদান অবমুক্ত করে। যেমন- ইউরিয়া সার মাটিতে প্রয়োগের সাথে সাথে গলে গিয়ে গাছকে NH_4^+ বা NO_3^- সরবরাহ করে। অন্যদিকে এ সার মাটিতে বেশি দিন থাকে না। তাই ইউরিয়া সার ধান গাছের জীবদ্দশায় প্রায় তিনবার প্রয়োগ করা হয়। অন্যদিকে টিএসপি, এমওপি, জিপসাম ও দস্তা সার একবার প্রয়োগ করলেই চলে। ইউরিয়া সার সমান তিনভাগে ভাগ করে শেষ চাষের সময় অথবা চারা রোপণের ১৪/১৫ দিন পর, কুশি উৎপাদনের মধ্য সময় এবং কাইচথোড় পর্যায়ের পূর্বাবস্থায় দেওয়া হয়। টিএসপি, এমওপি, জিপসাম ও দস্তা সার শেষ চাষের সময় মাটিতে প্রয়োগ করা হয়।

সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা

সেচনির্ভর ধানে যথেষ্ট পানি সেচ দিতে হয়। তবে ধানের জমিতে সব সময় দাঁড়ানো পানি রাখার প্রয়োজন নেই। চারা রোপণের পর ১০-১২ দিন পর্যন্ত এবং কাইচথোড় বের হওয়ার সময় এক সপ্তাহ একটু বেশি পানি প্রয়োজন হয়। এ সময় জমিতে ছিপছিপে পানি রাখা আবশ্যক। তবে লক্ষ রাখতে হবে যে জীবদ্দশায় ধান গাছ যেন পানির স্বল্পতায় না পড়ে। বৃষ্টিনির্ভর রোপা আমন ধানে উঁচু করে আইল করে বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে হয়। প্রয়োজনে বৃষ্টিনির্ভর এ সকল ধানে সম্পূরক সেচ দেওয়া যেতে পারে।

আগাছা দমন

ক্ষেতে ধান ব্যতীত অন্য যে কোনো গাছকেই আগাছা বলা যায়। আগাছা ধান গাছের সাথে জায়গা, আলো, পানি এবং খাদ্য উপাদান নিয়ে প্রতিযোগিতা করে। ফলে আগাছা ধানের বাড়-বাড়তি কমিয়ে ফেলে এবং ধানের ফলন কমিয়ে দেয়। এ জন্য আগাছা দমন করা খুব জরুরি। আউশ ও আমন মৌসুমের জন্য ৩০-৪০

দিন এবং বোরো মৌসুমের জন্য ৪০-৫০ দিন জমি আগাছামুক্ত রাখা প্রয়োজন। এর পর ধান গাছ বড় হয়ে যায়। ফলে তখন আলো ও জায়গার অভাবে আগাছা আর তেমন জন্মাতে বা বাড়তে পারে না।

আগাছা সাধারণত তিন ভাবে দমন করা যায়। হাত দিয়ে, নিড়ানি যন্ত্রের সাহায্যে বা আগাছানাশক ব্যবহার করে। রোপণ করা জমিতে চারা রোপণের পর ৫-১০ সে.মি. পানি ধরে রাখলে আগাছা কম জন্মে। এ সব জমিতে কমপক্ষে দুইবার আগাছা দমন করা প্রয়োজন। ধান রোপণের ১৫-২০ দিন এবং ৩০-৩৫ দিন পর পর আগাছা দমন করা প্রয়োজন। তবে প্রয়োজনে আরও একবার আগাছা দমন করা যায়। সাধারণভাবে হাত দিয়ে তুলে আগাছা দমন করা যায়। নিড়ানি যন্ত্র ব্যবহার করলে যন্ত্রটি ধানে দুই সারির মাঝ দিয়ে চালিয়ে আগাছা উপড়ে ফেলা হয়। কিন্তু দুই গুছির মাঝে যে আগাছা থাকে তা আবার হাত দিয়ে তুলে দিতে হয়। অন্যদিকে আগাছানাশক ব্যবহার করে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আগাছানাশক হলো এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ। এগুলো সঠিক মাত্রায় সঠিক সময়ে প্রয়োগ করে আগাছা মেরে ফেলা যায়। এতে ধান গাছের তেমন ক্ষতি হয় না। পানিতে মিশিয়ে স্প্রে মেশিন দিয়ে অথবা দানাদার আগাছানাশক হাত দিয়েও ছিটিয়ে প্রয়োগ করা হয়।

পোকামাকড় দমন

ধান গাছের কিছু অনিষ্টকারী পোকামাকড় রয়েছে যা গাছের কাণ্ড, পাতা, শিষ এমনকি কচি ধান খেয়ে ধানের অনেক ক্ষতি করে। অনেক সময় পোকা বেশি করে আক্রমণ করলে এবং সঠিক সময় এর নিয়ন্ত্রণ না করলে ক্ষেত থেকে কোনো ধানই আহরণ করা যায় না। ধানের অনেক অনিষ্টকারী পোকা রয়েছে। মাজরা, পামরি, বাদামি গাছ ফড়িং, গান্ধি পোকা, লেদা পোকা, চুংগি পোকা, গল মাছি, পাতা মোড়ানো পোকা, পাতা মাছি, ঘাসফড়িং ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য পোকা। এসব পোকা দমনে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়, যেমন-

১। ধান আবাদের পূর্বে পূর্ববর্তী ফসলের নাড়া পুড়িয়ে ফেলা।
২। পোকার ডিমের গাদা সংগ্রহ করে নষ্ট করে ফেলা।
৩। আলোক ফাঁদের সাহায্যে পূর্ণবয়স্ক পোকা সংগ্রহ করে দমন করা।
৪। হাতজাল বা মশারির কাপড় দিয়ে পোকা ধরে মেরে ফেলা।
৫। ধান ক্ষেতে ডালপালা পুঁতে দিয়ে পোকাখেকো পাখি বসার ব্যবস্থা করে দেওয়া যাতে পাখি পোকা খেতে পারে।

চিত্র: ডালপালার উপর পোকাখেকো পাখি বসা

৬। প্রয়োজনে আক্রান্ত জমি থেকে পানি সরিয়ে দেওয়া।
৭। ক্ষেতে পোকার সংখ্যা ফসলের ক্ষতিকর মাত্রায় পৌঁছালে উপযুক্ত কীটনাশক সঠিক মাত্রায় এবং পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা।

রোগ ব্যবস্থাপনা

ধান গাছ বিভিন্ন ধরনের রোগ-জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। রোগের আক্রমণে ধানের ফলন কমে যায়। ধান গাছ ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস বা কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। আক্রান্ত হলে ধানের রোগ শনাক্ত করে উপযুক্ত দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। ধানের বিভিন্ন রোগের ভিন্ন ভিন্ন দমন ব্যবস্থা রয়েছে। যদিও রোগ ব্যবস্থাপনার সকল পদ্ধতি কেবল একটি রোগে প্রয়োগ করা হয় না, কেবল প্রযোজ্য দমন পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করা হয়। নিম্নে ধানের সাধারণ রোগ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলো উল্লেখ করা হলো:

১। রোগমুক্ত ভালো বীজ ব্যবহার করা।

২। রোগাক্রান্ত জমির ফসল কাটার পর নাড়া পুড়িয়ে ফেলা।

৩। সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার করা।

৪। জমিতে প্রয়োজনে পানি ধরে রাখা বা পানি শুকিয়ে ফেলা।

৫। মাত্রাতিরিক্ত ইউরিয়া সার ব্যবহার না করা।

৬। সঠিক মাত্রায় পটাশ সার ব্যবহার করা এবং প্রয়োজনে পটাশ সার দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করা।

৭। কোনো কোনো রোগের ক্ষেত্রে প্রাথমিক আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলা।

৮। কোনো কোনো রোগের ক্ষেত্রে বাহক পোকা মেরে ফেলার ব্যবস্থা নেওয়া।

৯। প্রয়োজনে সঠিক বালাইনাশক প্রয়োগ করা।

ধান কর্তনোত্তর প্রযুক্তি

ধানের শিষের ৮০% ধান পেকে গেলে দেরি না করে ধান কাটা প্রয়োজন। ধান কাটার পর মাঠে কোনো ধান না রেখে তাড়াতাড়ি মাড়াইয়ের পর ধান ভালোভাবে ঝেড়ে কয়েকটি রোদ দিয়ে শুকিয়ে নেওয়া দরকার।

ধান চাষে কিছু বিশেষায়িত প্রযুক্তি

সারা বাংলাদেশে এক বা একাধিক মৌসুমে ধান চাষ হয়। দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অধিক ফলন ফলানোর জন্য উপযুক্ত জাত ও বিপুল পরিমাণে রাসায়নিক সার, বালাইনাশক ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ এবং ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করা হয়। এ সকল উপকরণের যথেচ্ছ ব্যবহার আমাদের পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে থাকে। তবে এগুলোর বিবেচনাপ্রসূতভাবে সঠিক মাত্রায়, সঠিক সময়ে পরিমিত ব্যবহার করলে তা পরিবেশের উপরও কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারবে না। বরং এ সকল উপকরণ ধানের অধিক ফলন উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। অন্যদিকে উপকরণবিহীন ধান চাষে ধানের ফলন অনেক কমে যায়। ফলে তা দেশের বিরাট জনগোষ্ঠীর খাদ্যের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হবে। এতে এদেশের মানুষ ও পরিবেশ আরও বৃহত্তর ঝুঁকিতে পড়বে। তাই এ সকল উপকরণ সঠিকভাবে পরিমিত পরিমাণে ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। ধান চাষে বেশ কিছু পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি রয়েছে, যা সংক্ষেপে নিচে তুলে ধরা হলো-

বিভিন্ন পরিবেশ উপযোগী ধানের জাত

উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত মৌসুম ও নির্দিষ্ট পরিবেশ উপযোগী করে উদ্ভাবন করা হয়। বৃহত্তর পরিবেশের উপযুক্ত ধানের জাত দেশের ধানের ফলন বৃদ্ধিতে বিরাট ভূমিকা রাখে এবং এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে খাদ্য ঝুঁকির হাত থেকে রক্ষা করে। এ সকল জাতের মধ্যে আউশ মৌসুমের ধান ব্রি ধান৪৮, আমন মৌসুমের ধান বিআর১১, বোরো মৌসুমের ধান ব্রি ধান২৮ ও ব্রি ধান২৯ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও প্রতিকূল পরিবেশে আবাদযোগ্য অনেক উফশী ধানের জাত রয়েছে।

খরাপ্রবণ এলাকায় রোপা আমন মৌসুমে শেষের দিকে ধানে প্রান্তিক খরা পড়ে। এ সকল খরা থেকে বাঁচার জন্য অনেক সময় সম্পূরক সেচ দেওয়া দরকার হয়। এই সকল পরিবেশের জন্য খরাসহিষ্ণু জাত হলো ব্রি ধান৫৫।

লবণাক্ত অঞ্চলে লবণাক্ত সহিষ্ণু ধানের জাত ব্যবহার করতে হয়। এ সকল অঞ্চলে সেচের পনিতেও লবণাক্ততা থাকে বলে সেচ দেওয়া যায় না। লবণাক্ত অঞ্চলের জন্য রোপা আমন মৌসুমের উফশী জাত হলো ব্রি ধান৪০, ব্রি ধান৪১। এ ছাড়াও বোরো মৌসুমের জন্য উপযুক্ত জাত হলো ব্রি ধান৪৭।

প্রচুর বৃষ্টির কারণে বা হঠাৎ বন্যার পানি বেড়ে যাওয়ার কারণে অনেক অঞ্চলের রোপা আমন ধান ১ থেকে ২ সপ্তাহ সময় পানিতে তলিয়ে গিয়ে মারা যেতে পারে। ডুবে গিয়েও এসব অঞ্চলে যেসব জাত মোটামুটি ভালো ফলন দেয় তা হলো ব্রি ধান৫১, ব্রি ধান৫২।

নাবিতে রোপা আমন রোপণ করলে অনেক দীর্ঘ জীবনকালের ধানে আগাম ঠাণ্ডার কারণে ধান চিটা হয়। এসব অঞ্চলের জন্য তীব্র আলোক সংবেদনশীল জাত বিআর২২, বিআর ২৩ বা ব্রি ধান৪৬ ব্যবহার করা যায়।

জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের জন্য লম্বা ও শক্ত কাণ্ডবিশিষ্ট ধানের জাত প্রয়োজন হয়। এ পরিবেশের জন্য উপযুক্ত উফশী জাত হলো ব্রি ধান৪৪ যা রোপা আমন মৌসুমে চাষ করা হয়।

আমাদের দেশের সুগন্ধি ধানের জাতের অনেকগুলোই স্থানীয় জাত যাদের ফলন কম। উফশী সুগন্ধি জাতের মধ্যে বিআর৫, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৩৮ উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও পুষ্টিসমৃদ্ধ ধানের জাত রয়েছে যাতে কোনো নির্দিষ্ট পুষ্টি উপাদান বেশি থাকে। যেমন-জিংকসমৃদ্ধ ধান, ব্রি ধান৬২।

বীজ বাছাই

বপনের জন্য ভালো ও পুষ্ট বীজ ব্যবহার করা জরুরি। ভালো বীজ হতে সুস্থ-সবল চারা উৎপন্ন হয়। এ জন্য বপনের পূর্বে ভালো বীজ ব্যবহার হচ্ছে কিনা জানা দরকার। অন্যদিকে রোগাক্রান্ত অপুষ্ট বীজ ব্যবহার করলে পরে অসুস্থ ও দুর্বল চারা উৎপন্ন হয়, ফলে ধান গাছ রোগাক্রান্ত হয়।

বীজ বাছাইয়ের জন্য দশ লিটার পরিষ্কার পানিতে ৩৭৫ গ্রাম ইউরিয়া সার মেশানো হয়। এবার ১০ কেজি বীজ পানিতে ছেড়ে হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে দেওয়া হয়। পুষ্ট বীজ ডুবে নিচে জমা হবে এবং অপুষ্ট, হালকা বীজ ভেসে উঠবে। হাত অথবা চালনি দিয়ে ভাসমান বীজগুলো সরিয়ে ফেলে ভারী ভালো বীজ নিচ থেকে তুলে নিয়ে পরিষ্কার পানিতে ৩-৪ বার ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। ইউরিয়া মিশানো পানি সার হিসেবে বীজতলায় ব্যবহার করা যায়।

দোআঁশ ও এঁটেল মাটি বীজতলার জন্য ভালো। বীজতলার জমি উর্বর হওয়া প্রয়োজন। জমিতে ৫-৬ সে.মি. পানি দিয়ে দুইতিনটি চাষ ও মই দিয়ে ৭-১০ দিন রেখে দিতে হবে এবং পানি ভালোভাবে আটকিয়ে রাখতে হবে। আগাছা, খড় ইত্যাদি পচে গেলে আবার চাষ ও মই দিয়ে কাদা করে জমি তৈরি করতে হবে। এবার জমির দৈর্ঘ্য বরাবর এক মিটার চওড়া বেড তৈরি করতে হবে । দুইবেডের মাঝে ২৫-৩০ সে.মি. জায়গা ফাঁকা রাখতে হবে। নির্ধারিত জমির দুইপাশের মাটি দিয়ে বেড তৈরি করা যায়। এরপর বেডের উপরের মাটি বাঁশ বা কাঠের চ্যাপটা লাঠি দিয়ে সমান করতে হবে। বেড তৈরির ৩/৪ ঘন্টা পর বীজ বোনা উচিত। বীজতলা তৈরির জন্য দুইবেডের মাঝে যে নালা তৈরি হয় তা খুবই প্রয়োজন। এ নালা যেমন- সেচের কাজে লাগে তেমনি পানি নিষ্কাশন বা প্রয়োজনে সার/ওষুধ ইত্যাদি প্রয়োগ করা সহজ হয়।

গুটি ইউরিয়া ব্যবহার

চিত্র: গুটি ইউরিয়া সার

গুটি ইউরিয়া হলো, ইউরিয়া সার দিয়ে তৈরি বড় আকারের গুটি যা দেখতে ন্যাপথালিন বলের মতো। গুটি ইউরিয়া ব্যবহারে সারের কার্যকারিতা শতকরা ২০-২৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ফলে ইউরিয়া সার কম লাগে। গুটি ইউরিয়া জমিতে একবারই প্রয়োগ করতে হয়। এরপর অব্যাহতভাবে গাছের প্রয়োজন অনুযায়ী নাইট্রোজেন সরবরাহ থাকায় গাছের কোনো সুপ্ত ক্ষুধা থাকে না।

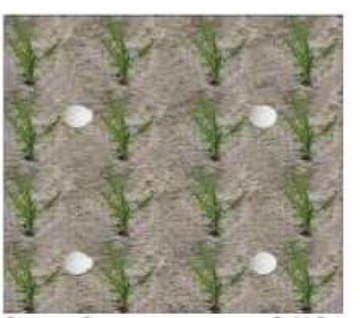

চিত্র: গুটি ইউরিয়ার প্রয়োগ পদ্ধতি

গুটি ইউরিয়া প্রয়োগের পূর্বশর্ত হলো, ধান রোপণ করতে হবে সারিবদ্ধভাবে। সারি থেকে সারি এবং গোছা থেকে গোছার দূরত্ব হবে ২০ সে.মি. (৮ ইঞ্চি)। বোরো মৌসুমে চারা রোপণের ১০-১৫ দিন এবং আউশ ও আমন মৌসুমে চারা রোপণের ৭-১০ দিনের মধ্যে প্রতি চার গোছার মাঝখানে ৩-৪ ইঞ্চি কাদার গভীরে গুটি পুঁতে দিতে হবে। জমিতে সব সময় প্রয়োজনীয় ২-৩ সে.মি. পানি রাখতে হবে। সাধারণত আউশ ও আমন ধানের জন্য ১.৮ গ্রাম ওজনের একটি গুটি এবং বোরো ধানের জন্য ২.৭ গ্রাম ওজনের একটি গুটি ব্যবহার করতে হবে, যার হেক্টরপ্রতি নাইট্রোজেন মাত্রা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫০ ও ৭৫ কেজি। ফলে আউশ ও আমন মৌসুমে প্রতি হেক্টরে ৬৫ কেজি এবং বোরো মৌসুমে ৮০-১০০ কেজি ইউরিয়া সাশ্রয় হয়।

২০১৬

সেচের এডব্লিউডি পদ্ধতি

বোরো মৌসুমে ধান আবাদে পানিসাশ্রয়ী আর একটি পদ্ধতির নাম অলটারনেট ওয়েটিং এন্ড ড্রায়িং বা এডব্লিউডি। এ পদ্ধতির জন্য প্রয়োজন হয় একটি ৭-১০ সে.মি. ব্যাস ও ২৫ সে.মি. লম্বা ছিদ্রযুক্ত পাইপ বা

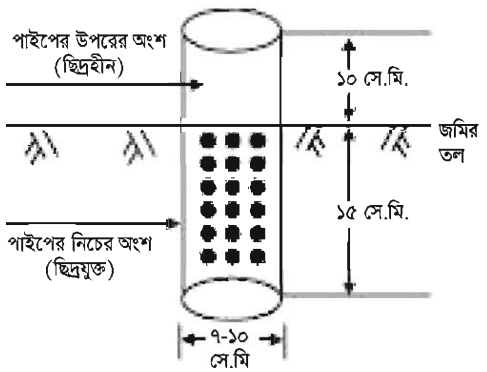

চোঙ। এটি চারা রোপণের ১০-১৫ দিনের মধ্যে জমিতে চারটি ধানের গোছার মাঝে খাড়াভাবে স্থাপন করতে হবে যেন এর ছিদ্রবিহীন ১০ সে.মি. মাটির উপরে এবং ছিদ্রযুক্ত ১৫ সে.মি. মাটির নিচে থাকে। এবার পাইপের তলা পর্যন্ত ভিতর থেকে মাটি উঠিয়ে নিতে হবে। মাটি শক্ত হলে গর্ত করে পাইপটি মাটিতে বসানো যেতে পারে। যখন পানির স্তর পাইপের তলায় নেমে যাবে তখন জমিতে এমনভাবে সেচ দিতে হবে যাতে দাঁড়ানো পানির পরিমাণ ৫-৭ সে.মি. হয়। আবার ক্ষেতের দাঁড়ানো পানি শুকিয়ে পাইপের তলায় নেমে গেলে পুনরায় সেচ দিতে হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে ভিজানো ও শুকানো পদ্ধতিতে সেচ চলবে জাতভেদে ৪০-৫০ দিন পর্যন্ত। যখনই গাছে থোড় দেখা দেবে তখন থেকে দানা শক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ক্ষেতে স্বাভাবিক ২-৫ সে.মি. পানি রাখতে হবে। দেখা গেছে, এডব্লিউডি পদ্ধতিতে বোরো ধানে সেচ দিলে দাঁড়ানো পানি রাখার চেয়ে ৪-৫টি সেচ কম লাগে এবং ফলনও কমে না। ফলে সেচের পানি, জ্বালানি ও সময় সাশ্রয় হয় এবং উৎপাদন খরচও হ্রাস পায়।

আইপিএম পদ্ধতি

বিভিন্ন পোকামাকড় বা রোগ-জীবাণু দমনে যথেচ্ছ বালাইনাশক ব্যবহার করলে তা পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে বালাই অর্থাৎ পোকামাকড় বা রোগ-জীবাণু ঐ সকল বালাইনাশকের প্রতি প্রতিরোধী হয়ে উঠে। ফলে পূর্বের ন্যায় আর বালাইনাশক তেমন কাজ করে না। ফলে আরও শক্তিশালী বালাইনাশক তৈরি করার প্রয়োজন হয়। এতে করে প্রকৃতিতে অনেক উপকারি যেসব পোকামাকড় বা জীবাণু আছে সেগুলোও ধ্বংস হয়। ফলে খাদ্যে বিষাক্ত বালাইনাশকের উপস্থিতি পাওয়া যায় এবং প্রকৃতিতেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এ থেকে বাঁচার জন্য আইপিএম বা Integrated Pest Management নামক পদ্ধতি

প্রয়োগ করার সুপারিশ করা হয়। এ পদ্ধতিতে বালাই দমন বা ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থা সমন্বিত পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হয়।

এরপরও বালাই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হলে সর্বশেষ পদ্ধতি হিসেবে রাসায়নিক বালাইনাশক সঠিক মাত্রায় সঠিক সময়ে প্রয়োগ করে বালাই নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আইপিএম বা সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনায় কোনো বালাইকে সম্পূর্ণ দমন করার চেষ্টা করা হয় না। এ ক্ষেত্রে বালাইকে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ক্ষতিকর পর্যায়ের নিচে নিয়ন্ত্রণ করে রাখা হয়। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার কতগুলি পদ্ধতি নিচে উল্লেখ করা হলো:

১। বালাই প্রতিরোধী জাত চাষ করা।
২। ভালো ও রোগ-জীবাণু ও পোকামাকড় মুক্ত বীজ ব্যবহার করা।
৩। সঠিক দূরত্বে চারা রোপণ করা।
৪। সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার করা।
৫। হাত বা যন্ত্রের সাহায্যে রোগাক্রান্ত বা পোকামাকড় আক্রান্ত ধানের পাতা বা শিষ তুলে ফেলা বা গাছ তুলে ফেলা।
৬। হাত জাল ইত্যাদি দিয়ে পোকা সংগ্রহ করা।
৭। আলোক ফাঁদ ব্যবহার করা।
৮। রোগ্রাক্রান্ত জমির নাড়া পুড়িয়ে ফেলা।
৯। ধান ক্ষেতে ডাল-পালা পুঁতে দিয়ে পোকাখেকো পাখির সাহায্যে পোকা দমন করা।
১০। সঠিক মাত্রায় পানি ব্যবস্থাপনা করা অর্থাৎ প্রয়োজনে পানি দেওয়া বা পানি বের করে ফেলা।
১১। এবং সর্বশেষে যদি বালাই ক্ষতিকর পর্যায়ের উপরে উঠে যায় তবে সঠিক মাত্রায় বালাইনাশক প্রয়োগ করে বালাই নিয়ন্ত্রণ করা।

উপসংহার

ধান আমাদের খাদ্যের প্রধান উৎস। সেই সাথে ধান আমাদের জীবিকা ও সংস্কৃতির অন্যতম উৎস। তাই ধানই আমাদের জীবন।

আলু উৎপাদন প্রযুক্তি

বাংলাদেশে সব জেলাতেই কমবেশি আলুর আবাদ হয়, তবে উত্তরাঞ্চলের জেলা, যেমন- জয়পুরহাট, রংপুর, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, বগুড়া, রাজশাহীসহ যশোর ও মুন্সিগঞ্জ জেলায় আলু চাষ বেশি হয়। বর্তমানে সরকারি সুষ্ঠু পরিকল্পনায় আলুর জমির পরিমাণ ও মোট উৎপাদন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে । আলুর ফলন বর্তমানে প্রায় ২০ টন/হে (২০১৪-২০১৫)। আলু এক ধরনের কাণ্ড যা মানুষের প্রধান খাদ্য হিসেবে পরিচিত।

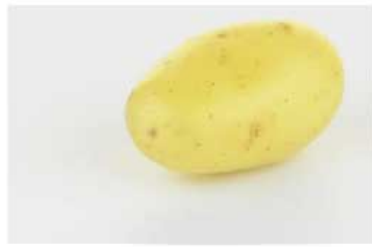

চিত্র: আলুর কন্দ

জাত নির্বাচন: এলাকা ও চাষের উদ্দেশ্যের উপর জাত নির্বাচন করতে হবে। আগাম চাষের জন্য বারি আলু-১৩ (গ্রানোলা), বারি আলু-৩১ (সাগিটা), বারি আলু-২৯ (কারেজ)। খাবার আলু হিসেবে বারি আলু-৭ (ডায়মন্ড), বারি আলু-৮ (কার্ডিনাল), বারি আলু-২৫ (এসটেরিক্স), বারি আলু-৩৫, বারি আলু-৩৬, বারি আলু-৩৭, বারি আলু-৪০, বারি আলু-৪১।

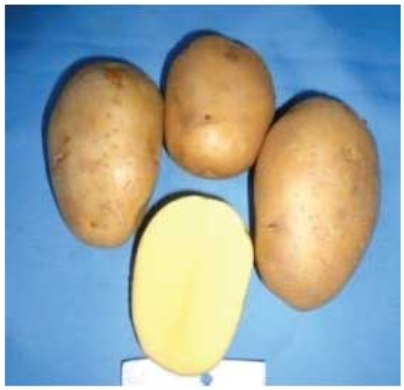

চিত্র: বারি আলু-৭ (ডায়মন্ড)

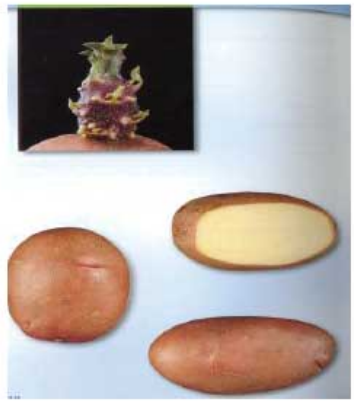

চিত্র: বারি আলু-৮ (কার্ডিনাল)

প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য বারি আলু-২৮ (লেডিরোসেটা), বারি আলু-২৯ (কারেজ) এবং রপ্তানির জন্য বারি আলু-১৩ (গ্রানোলা), বারি আলু-৪৩ (এ্যাটলাস)। মড়ক রোগ প্রতিরোধী জাত হলো বারি আলু-৪৬ ও বারি আলু-৫৩। বারি আলু-৪৮ ও বারি আলু-৬২ সাধারণ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ উপযোগী।

জমি নির্বাচন: বেলে দোআঁশ ও দোআঁশ মাটি আলু চাষের জন্য উত্তম।

জমি তৈরি: গরুর লাঙল, পাওয়ারটিলার/ ট্রাক্টর দ্বারা আড়াআড়িভাবে ৩-৪টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে প্রস্তুত করতে হবে।

রোপণ সময়: নভেম্বর মাস আলু লাগানোর উপযুক্ত সময়। বীজ আলুর জন্য ১৫ই নভেম্বর-এর মধ্যে বীজ রোপণ করা উত্তম। বর্তমানে দেশের উত্তরাঞ্চলে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে আগাম আলু লাগানো যেতে পারে এবং মধ্যাঞ্চলসহ দক্ষিণাঞ্চলে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত আলু লাগানো যাবে।

২০১৬

বীজের পরিমাণঃ বিঘায় ২০০-২৫০ কেজি বীজ আলু প্রয়োজন।

বীজ তৈরিঃ আলু ফসলের জন্য ৩০-৪০ গ্রাম ওজনের আস্ত আলু বীজ হিসেবে ব্যবহার করা উত্তম। কেটেও বীজ লাগানো যেতে পারে। প্রতিটি অংশে কমপক্ষে ২টি চোখ থাকতে হবে। বীজ লাগানোর ২ দিন পূর্বে আলু কেটে ছায়া স্থানে রেখে দিলে কাটা অংশের উপর একটা প্রলেপ পড়ে। পরিষ্কার ছাই মেখেও কাজটি করা যেতে পারে। এতে আলু পচন রোধ করা সম্ভব। আগাম আলুর ক্ষেত্রে অবশ্যই একটু ছোট আকারের আস্ত আলু লাগানো উত্তম।

চিত্রঃ- অঙ্কুরিত আলু

চিত্রঃ- সঠিকভাবে আলু কেটে বীজ তৈরি

চিত্রঃ- এভাবে আলু কেটে বীজ তৈরি করা যাবে না

রোপণ পদ্ধতিঃ ৬০×২৫ সে.মি. দূরত্বে আস্ত আলু এবং ৬০×১৫/১০ সে.মি. দূরত্বে কাটা আলু রোপণ করে আলুর উপর মাটি তুলে ভেলি বেঁধে দিতে হবে।

চিত্রঃ- লাইনে গোটা আলু স্থাপন

চিত্রঃ- লাইনে গোটা আলু স্থাপনের পর সারের নালা তৈরি করা

চিত্রঃ- লাইনে গোটা আলু স্থাপন ও সারের নালায় সার প্রয়োগের পর মাটি তুলে পিলি তৈরি করা

সারের মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি

সারের নাম	সারের পরিমান (হেক্টরে)
ইউরিয়া	৩৪০ কেজি
টিএসপি	২১০ কেজি
এমপি	২৩৫ কেজি
জিপসাম	১১০ কেজি
জিংক সালফেট	৯ কেজি
বোরন (প্রয়োজনবোধে)	৭ কেজি
গোবর	১০ টন

সার প্রয়োগ পদ্ধতিঃ গোবর ও জিংক সালফেট শেষ চাষের সময় জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। অর্ধেক ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি, জিপসাম ও বোরন সার রোপণের সময় বীজ রোপণ লাইনের উভয় পাশে ১০-১২ সে.মি. দূরে লাইন টেনে ব্যান্ড পদ্ধতিতে সার দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর অর্থাৎ দ্বিতীয়বার মাটি তোলার সময় প্রয়োগ করতে হবে। এতে সারের সঠিক প্রয়োগ হয়। সার প্রয়োগের পর সাথে সাথে সার ও বীজ মাটি দিয়ে ভেলি তুলে ঢেকে দিতে হবে।

সার প্রয়োগের নালা এবং বীজ আলু রোপণের সারির নকশা নিচে দেখানো হলো

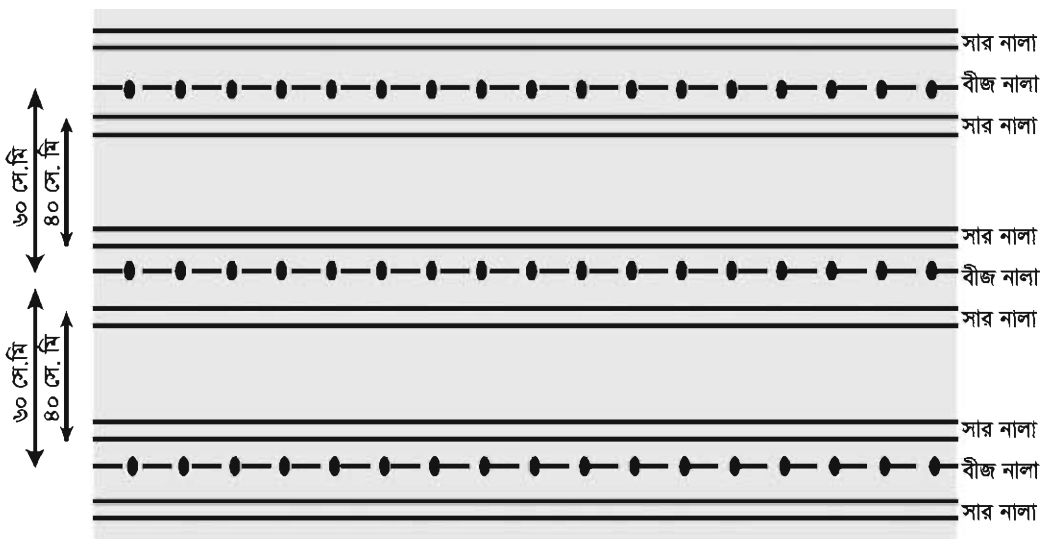

চিত্রঃ সার প্রয়োগের নালা এবং বীজ আলু রোপণের সারির নকশা

সেচ প্রয়োগঃ বীজ রোপণের ২-৩ সপ্তাহ পর সেচ দেওয়া উত্তম । মোট ২-৩টি সেচ প্রয়োগ করা প্রয়োজন হতে পারে (২০-২৫ দিনের মধ্যে স্টোলন বের হওয়ার সময়। ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে গুটি বের হওয়া পর্যন্ত এবং পরে আলু বৃদ্ধির সময়)। জমি থেকে আলু উঠানোর ৭-১০ দিন পূর্বে মাটি ভেদে সেচ প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যাঃ আলু লাগানোর ৩০-৩৫ এবং যদি আলু মাটি থেকে বেরিয়ে আসে তবে ৫৫-৬০ দিন পর গোড়ায় মাটি তুলে দেওয়া প্রয়োজন। মাটি তুলে দেওয়ার পূর্বে আগাছা নিড়িয়ে দিতে হবে।

রোগবালাই ও পোকামাকড় দমনঃ নিম্ন তাপমাত্রা, কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া ও মেঘলা আকাশ আলুর জন্য ক্ষতিকর। এতে আলুর নাবি ধসা রোগ আক্রমণের আশঙ্কা দেখা যায়। আলু ফসলকে আলুর নাবি ধসা রোগ প্রতিরোধ করার জন্য স্পর্শক (কন্ট্রাক্ট) ছত্রাকনাশক, যেমন- ইন্ডোফিল, ডায়থেন এম ৪৫/ম্যানকোজেব/ইন্ডোফিল/মেলোডি ডুও/সিকিউর (২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে) ৭ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে। জাবপোকার আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এডমায়ার ২০০ এসএল, ইমিটাফ ২০ এসএল এবং কনফিডেন্ট ২০০ এসএল ব্যবহার করতে হবে।

কাটুই পোকা আলুর কচি গাছ কেটে ফেলে এবং আলু ছিদ্র করে আলুর মান নষ্ট করে ফেলে। এই পোকার আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সকালে জমিতে গিয়ে কর্তিত চারার গোড়া খুঁড়ে কিড়াগুলো মেরে ফেলতে হবে। আক্রমণ তীব্র হলে প্রতি লিটার পানির সাথে ৫ মিলি ডারসবান ২০ ইসি জাতীয় কীটনাশক মিশিয়ে চারাগাছগুলির গোড়ায় মাটি ভিজিয়ে ভালোভাবে স্প্রে করে কাটুই পোকা দমন করা যায়।

ফসল সংগ্রহঃ জাতভেদে আলু লাগানোর ৮০-১০০ দিনের মধ্যে উত্তোলন করা যায়। আলু উত্তোলনের পর পরই বাড়িতে নিয়ে আসা উত্তম।

ফলনঃ জাতভেদে আলুর বিঘাপ্রতি ২.৫-৩.০ টন ফলন পাওয়া যায়।

আলু সংরক্ষণঃ আলু সংগ্রহের সাথে সাথে কাটা ও পচা আলু বাদ দিয়ে ঠাণ্ডা জায়গায় সাত দিন কিউরিং করতে হবে। পরে বস্তায় ভরে আলু সংরক্ষণ করতে হবে। এছাড়া ঠাণ্ডা জায়গায় ঢেলে রেখে দুই তিন মাস পর্যন্ত কৃষক নিজের প্রয়োজন মেটাতে পারে।

চিত্রঃ সারিতে আলুবীজ স্থাপন

চিত্রঃ আলু রোপণের পর মাটি তুলে ভেলি তৈরি

চিত্রঃ ভেলির মাঝখানে তিনের দুই অংশে সেচ প্রদান

ভাসমান বেডে ফসল চাষ প্রযুক্তি

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অভিযোজন কৌশল হিসেবে বাংলাদেশের ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি ও মশলা উৎপাদন পদ্ধতি জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (এফএও) কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে। বন্যা ও জলাবদ্ধ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন কৌশল হিসেবে ভাসমান ধাপে সবজি ও মশলা চাষ একটি লাগসই প্রযুক্তি। ভাসমান বেডে সবজি ও মশলা চাষ পদ্ধতিতে নিচু, পতিত, জলমগ্ন, খাল, হাওড় বা হ্রদে অনাবাদি জমিকে চাষের আওতায় আনা যায়। কচুরিপানায় নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়ামের পরিমাণ পচা গোবর বা কম্পোস্ট অপেক্ষা বেশি থাকে। তাই কম পরিমাণে রাসায়নিক সার ও বালাইনাশক ব্যবহার করে ভাসমান বেডে জৈব পদ্ধতিতে পরিবেশবান্ধব ফসল উৎপাদন করা যায়। এ পদ্ধতিতে একই জমিতে পরিকল্পিতভাবে মাছ, সবজি ও মশলা চাষ করা যায়। জলাবদ্ধ এলাকায় গরিব কৃষকদের আয় বাড়ে এবং সারা বছর কাজের সুযোগ তৈরি হয়। মৌসুম শেষে ধাপ পচিয়ে প্রচুর পরিমাণে জৈব সার উৎপাদন করা যায়। এসব জৈব সার জমিতে ব্যবহার করে জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ করা যায়।

পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলার কৃষকরাই প্রথম ভাসমান পদ্ধতিতে চাষাবাদ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন প্রায় দেড়শ বছর আগে। বিল এলাকা হওয়ায় নাজিরপুর উপজেলার দেউলবাড়ী ও দোবড়া ইউনিয়নের বেশির ভাগ জমি পানিতে ডুবানো থাকত। বছরের পর বছর জুড়ে পতিত এ জমিতে কচুরিপানা, দুলালীবন, শেওলা ও ফেনা ঘাসে ভরা থাকত। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে স্থানীয় কৃষকরা সম্মিলিত উদ্যোগে জমির পানিতে প্রাকৃতিকভাবে জন্ম নেওয়া কচুরিপানা, শেওলা, দুলালীবন পচিয়ে সারি সারি কান্দি (আইল) তৈরি করে তার উপর ফসল চাষের চেষ্টা করে সফল হন। ইতিমধ্যে ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি চাষ দেশের বন্যা ও জলাবদ্ধপ্রবণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে।

ভাসমান বেডে বা ধাপে ফসল চাষের উপকারিতা

ভাসমান বেডে ফসলের উৎপাদন খরচ কম। সারা বছর বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে যখন সবজি চাষের জমি পানিতে তলিয়ে যায় অথবা বৃষ্টির পানি জমে থাকার কারণে সমতল ভূমিতে সবজি চাষ করা যায় না তখন ভাসমান বেডে সবজি চাষ করা যায় এবং বাজারমূল্য বেশি হওয়ায় কৃষক আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারেন। অতিরিক্ত বৃষ্টি ও মৌসুমি বন্যায় ভাসমান বেডের ফসলের তেমন ক্ষতি হয় না।এ কারণে বন্যা এলাকায় আগাম সবজির চারা তৈরি করা যায় এবং বন্যায় আমন ধানের চারা তৈরি করা যায়।

ভাসমান বেড তৈরির স্থান নির্বাচন

ঘন কচুরিপানা আছে এমন সব হাওর, বিল, খাল, মজা পুকুর যেখানে বছরের ৬ মাস বা তারও বেশি সময় পানি জমে থাকার কারণে ফসল চাষ করা সম্ভব হয় না; এমন স্থান ভাসমান বেড তৈরির জন্য নির্বাচন করতে হবে।

ভাসমান বেডের আকার

ভাসমান বেডের দৈর্ঘ্য জমির দৈর্ঘ্য অনুযায়ী করতে হয়। বেডের প্রস্থ বা চওড়া এবং উচ্চতা ১.২৫ মিটার হবে। ভাসমান বেডের উপর উঠা যাবে না, ছোট নৌকা বা ভেলার সাহায্যে পাশে থেকে বীজ বপন/চারা রোপণ, ফসলের পরিচর্যা ও ফসল সংগ্রহ করার জন্য বেডের চওড়া ১.২৫ মিটার রাখা ভালো। বেডের পুরুত্ব কাঁচা অবস্থায় ১.৫০ মি. রাখা ভালো। বেডের পুরুত্ব যত বেশি হয় বেডের স্থায়িত্ব তত বেশি হয়; পাশাপাশি দুইটি বেডের দূরত্ব ১.২৫ মিটার রাখতে হয়। এতে ছোট নৌকা বা ভেলা দিয়ে দুই বেডের মাঝখানে সহজে আসা-যাওয়া করা যায় এবং ভাসমান বেডে লাগানো সবজি ও মশলার প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করা যায় এবং ফসল সংগ্রহ করা যায়।

ভাসমান বেড (ধাপ) তৈরির উপকরণ

ভাসমান বেড তৈরির প্রধান উপকরণ কচুরিপানা। এছাড়া টোপাপানা, শেওলা, বিভিন্ন ধরনের জলজ আগাছা, ধানের খড় বা ফসলের অবশিষ্টাংশ, আখের ছোবড়া ব্যবহার করে এ ভাসমান বেড তৈরি করা যায়। পূর্ণতাপ্রাপ্ত গাঢ় সবুজ রঙের বড় ও লম্বা কচুরিপানা দিয়ে বেড তৈরি করা হলে বেডের স্থায়িত্ব বেশি হয়। বেডের আয়তনের ৫ (পাঁচ) গুণ জায়গার কচুরিপানা ব্যবহার করে বেড তৈরি করতে হয়। এছাড়া ভাসমান বেডে চারা তৈরি করার জন্য পচা কচুরিপানা, সোনা শেওলা, টোপাপানা, দুলালীলতা, কয়ার ডাস্ট (নারিকেলের ছোবড়ার গুঁড়া), খড় ইত্যাদি প্রয়োজন হয়।

চিত্র : ভাসমান বেড তৈরির জন্য স্থান নির্বাচন

ভাসমান বেড (ধাপ) তৈরির সময়

বর্ষার শুরুতে যখন কচুরিপানা দ্রুত বংশ বিস্তার শুরু করে। আষাঢ়-শ্রাবণ (মধ্য জুন-মধ্য আগস্ট) মাসে এই ভাসমান বেড তৈরি করার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। জোয়ার-ভাটা এলাকায়, মজা পুকুরে, হাওর এলাকায় সারা বছর ভাসমান বেড তৈরি করে সবজি আবাদ করা যায়। এলাকা ভেদে জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে শুরু করে কার্তিক মাস পর্যন্ত বেড তৈরি করা যায়। এছাড়া কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে কচুরিপানা আবদ্ধ থাকলে সেই কচুরিপানা ও অন্যান্য জলজ আগাছা, ধানের খড়, ফসলের অবশিষ্টাংশ, শেওলা প্রভৃতি স্তূপ করে শুকনা স্থানে বেড তৈরি করে রাখা হয়। এগুলো পরবর্তী মৌসুমে পানি আসার সাথে সাথে এগুলো ভেসে উঠে এবং সবজি ও মশলা চাষের উপযুক্ত হয়। মৌসুম শেষে পানির স্তর নেমে যাওয়ায় বেড যদি মাটির উপর বসে যায় তবে তা ভেঙে জমিতে বিছিয়ে কোনো প্রকার চাষ, মই, সার ছাড়াই সফলভাবে শীতকালীন সবজি ও মশলা উৎপাদন করা যায়।

ভাসমান বেড তৈরির পদ্ধতি

ভাসমান বেড তৈরির জন্য পানির গভীরতা কম হলে পানিতে দাঁড়িয়ে পাশ থেকে কচুরিপানা ও অন্যান্য জলজ আগাছা সংগ্রহ করে বেড তৈরি করতে হয়। পানির গভীরতা বেশি হলে নির্বাচিত ঘন কচুরিপানার উপরে বাঁশ ফেলতে হয়। এরপর বাঁশের উপর দাঁড়িয়ে বাঁশের চারপাশ থেকে কচুরিপানা টেনে এনে জড়ো করে ভাসমান

বেড তৈরি করতে হয়। বেড তৈরি শেষে বাঁশ বের করে নেওয়া যায়; তবে ভাসমান বেডকে শক্তিশালী করা এবং ভেসে থাকার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বাঁশ রেখে দেওয়া ভালো। বেডের স্থায়িত্ব নির্ভর করে ১ম স্তরের উপর। বেডের ১ম স্তরে যদি ঘন, লম্বা ও পুরু কচুরিপানা ব্যবহার করা হয় তাহলে বেডের স্থায়িত্ব বেশি হয়। বেড তৈরির ২/৩ অংশ শেষ হলে উপরের দিকের ১/৩ অংশের কচুরিপানার শিকড় উপরের দিকে এবং কাণ্ডগুলো নিচের দিক করে আস্তে আস্তে প্রস্থ থেকে দৈর্ঘ্যের বরাবরে সাজাতে হবে। বেডের উপরের ১/৩ অংশে অপেক্ষাকৃত ছোট কচুরিপানা দিতে হবে। বেডের সাথে প্রাকৃতিক স্তর হিসেবে পানিতে লেগে থাকা কচুরিপানার বাড়তি অংশ ধারালো দা/হাসুয়া দিয়ে কেটে দিতে হবে। প্রস্তুতকৃত বেডের উপরিভাগ হাত বা কাঠি দিয়ে সমতল করতে হয়। প্রাথমিকভাবে ভাসমান বেড তৈরির পর ১০-১৫ দিন ফেলে রাখা হয় যাতে কচুরিপানাগুলো পচে ফসল বপন/রোপণের উপযোগী হয়। তবে সদ্য তৈরি বেডের উপর পচা কচুরিপানা (শুকানো) অথবা কম্পোস্ট দিয়ে ২-৩ ইঞ্চি পুরু স্তর তৈরি করে সরাসরি বীজ বপন করা যায় বা চারা রোপণ করা যায়।

চারা তৈরি বা বীজ বপন

সাধারণত বড় আকারের বীজ যেমন- লাউ, মিষ্টিকুমড়া, শিম, বরবটির জন্য বলে চারা তৈরি করে রোপণ করতে হয়। পচা কচুরিপানা দিয়ে অথবা টোপাপানা , কচুরিপানার শিকড় দিয়ে বল তৈরি করে ভাসমান বেডে রোপণের জন্য চারা তৈরি করা হয়। বলে বীজ স্থাপন করার আগে বীজগুলো ভিজিয়ে (বীজের আকার অনুযায়ী ০৫-২০ ঘণ্টা) নিতে হয়। এতে বীজের অঙ্কুরোদগম ভালো হয়। ছোট আকারের বীজ হলে সরাসরি বেডে বপন করা যায়। রোপণের পূর্বে বীজ ডাবল একশন কমপ্যোনিয়ন৩ গ্রাম/কেজি বীজ ছত্রাকনাশক দিয়ে শোধন করে নেওয়া ভালো। এতে বীজবাহিত রোগের প্রকোপ কম হয়।

চিত্র : পচা কচুরিপানা দিয়ে বল তৈরি করা হচ্ছে

ভাসমান বেডে যেসব ফসল চাষ করা যায়

গ্রীষ্ম ও বর্ষা মৌসুমে ভাসমান বেডে কলমিশাক, লালশাক, ডাঁটা, ঢেঁড়শ, বরবটি, ঝিঙে, শসা, করলা, চিচিঙ্গা, বেগুন, পুঁইশাক, মিষ্টিকুমড়া, স্কোয়াশ এবং পানিকচু চাষ করা যায়। শীত মৌসুমে পালংশাক, লালশাক, ধনেপাতা, ফুলকপি, ব্রোকলি, ওলকপি, মুলা, লাউ, শিম, মরিচ, লেটুস, পেঁয়াজ, রসুন চাষ করা যায়। ভাসমান বেডে সবজির চারাও উৎপাদন করা যায়।

চিত্র : ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা

২০১৬

ভাসমান বেডে ফসলের পরিচর্যা

উৎপাদন বাড়ানোর জন্য পরিচর্যার দিকে বেশি যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। ফসলের পরিচর্যার কাজে ছোট নৌকা বা ভেলা ব্যবহার করতে হয় ।

১। ভাসমান বেডে ইউরিয়া সার ব্যবহার করা যাবে না। ইউরিয়া ব্যবহার করলে বেড দ্রুত পচে যাবে। তবে কোনো কারণে গাছের বাড়-বাড়তি কম হলে চারা রোপণের বা বীজ বপনের ২০-৩০ দিন পর প্রতি লিটার পানির সাথে ১০ গ্রাম হারে ইউরিয়া পানিতে গুলে শুধুমাত্র পাতায় স্প্রে (ফলিয়ার) করা যেতে পারে ।

২। বেডের উপর হাঁস উঠে চারা ও ফসলের ক্ষতি করে । এজন্য বেডগুলো পাশাপাশি রেখে নেট বা জাল দিয়ে ঘিরে রাখতে হবে । অনেক সময় বেডগুলো পানির স্রোত বা বাতাসে ভেসে যেতে পারে । সেজন্য বাঁশ পুঁতে বেডগুলো নিরাপদ স্থানে রাখতে হবে । শিম, বরবটি ইত্যাদি লতানো গাছের জন্য মাচা বা বাউনি হিসেবে বেডের উপর ডাল বা কঞ্চি পুঁতে দিতে হবে।

৩। ফসল পোকা দ্বারা আক্রান্ত হলে আইপিএম (IPM) কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে পোকা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যেমন- প্রথম দিকে যখন পোকার সংখ্যা কম থাকে তখন হাত দিয়ে বা হাত জাল দিয়ে পোকা ধরে মারতে হবে। পোকার আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে উপযুক্ত কীটনাশক সঠিক সময়ে স্প্রে করতে হবে। স্প্রে এমনভাবে করতে হবে যেন কীটনাশক মাছের কোনো ক্ষতি করতে না পারে।

চিত্র : ভাসমান বেডে সবজি

জলাবদ্ধ এলাকার কচুরিপানা ব্যবহার করে সবজি ও মশলা উৎপাদন করলে পুষ্টি জোগানের পাশাপাশি পচা কচুরিপানা জমিতে জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করলে জমির উর্বরা শক্তি বাড়বে। উপরন্তু মৌসুম শেষে পানির স্তর নেমে যাওয়ায় বেড যখন মাটির উপরে বসে যায় তখন তা ভেঙে জমিতে বিছিয়ে কোনো প্রকার চাষ, মই, সার ছাড়াই সফলভাবে শীতকালীন সবজি ও মশলা উৎপাদন করা যায়। এছাড়া, মৌসুম শেষে পচা কচুরিপানা ফল গাছের গোড়ায় সার হিসেবে ব্যবহার করে ফলের উৎপাদন বাড়ানো যায়।

ফল ও সবজি উৎপাদনে উত্তম কৃষি পদ্ধতি (জিএপি)

জিএপি (GAP) হলো একধরনের পদ্ধতি যা সামগ্রিক কৃষি কার্যক্রমের পরিবেশগত, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সুরক্ষা সুসংহত করে, ফলশ্রুতিতে নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত কৃষিজাত পণ্য সহজলভ্য হয়। ইহা একগুচ্ছ নীতি-বিধি ও প্রযুক্তিগত সুপারিশমালা যা সামগ্রিক কৃষি উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও পরিবহনের বিভিন্ন স্তরে প্রয়োগ করা হয়।

বাংলাদেশ হতে বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ৫০-৬০টি কৃষিপণ্য (ফলমূল ও শাকসবজি) নিয়মিত রপ্তানি হচ্ছে এবং ক্রমেই তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া, ইউরোপের মূল মার্কেটে বাংলাদেশি কৃষিপণ্য রপ্তানির বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) কর্তৃক আরোপিত পরিচ্ছন্নতার মান বিষয়ক নীতিমালার কারণে বাংলাদেশসহ বহু উন্নয়নশীল দেশ কৃষিপণ্য (ফলমূল ও শাকসবজি) রপ্তানিতে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই Good Agricultural Practices (GAP) অনুসরণ করে নিরাপদ ও মানসম্পন্ন ফলমূল ও শাকসবজি উৎপাদন যেমন- সম্ভব পাশাপাশি রপ্তানিও সহজতর করা সম্ভব হচ্ছে।

কৃষি উৎপাদন থেকে পণ্য পরিবহন, বাজারজাত, গুদামজাত ও সংরক্ষণকালে নানা প্রকার ঝুঁকির মোকাবেলা করতে হয়। এ সকল প্রতিবন্ধকতা থেকে কৃষিজাত পণ্য বিশেষ করে ফল ও সবজিকে নিরাপদ রাখা অত্যন্ত জরুরি। পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা নিরাপদ ও মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে Good Agricultural Practices (GAP) প্রবর্তন করা হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও GAP কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

জিএপি-এর গুরুত্ব

জিএপি নিরাপদ ও মানসম্পন্ন কৃষিজাত খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য কৃষিপণ্য উৎপাদন ও সরবরাহের মাধ্যমে জনসাধারণের খাদ্য নিরাপত্তা সুরক্ষা ও কৃষি উৎপাদন পরিবেশ উন্নত করে। জমি ও পানির দূষণ রোধ, কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং প্রক্রিয়াকরণ ও পরিবহন ব্যবস্থপনা সুসংহত করে। ইহা কৃষি উৎপাদন কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে। জিএপি অনুসরণে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। সর্বোপরি দেশে এবং বহির্বিশ্বে কৃষি পণ্যের নতুন ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি করে উৎপাদনকারী তথা কৃষকের জীবনমানের উন্নয়ন সাধন করে। এছাড়া, জিএপি প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার, শ্রমিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও কাজের পরিবেশ উন্নত করে।

সবজি ও ফল উৎপাদনে জিএপি

জিএপি নীতিমালায় ফসল উৎপাদনের প্রতিটি স্তরের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে যা নিরাপদ এবং মানসম্পন্ন ফলন প্রাপ্তি নিশ্চিত করে। তবে ফসল উৎপাদনের শুরু থেকেই জিএপি নীতি ও সুপারিশমালা অনুসরণ আবশ্যক। ফসল ও জাতভেদে জিএপি নীতি ও সুপারিশমালায় কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে।

১) স্থান নির্বাচন বিষয়ে জিএপি-এর নির্দেশনা

ফল ও সবজি উৎপাদনে উপযুক্ত স্থান নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফসল ও জাতের গুণাগুণ বিবেচনা করে স্থান নির্বাচন করতে হবে। স্থান নির্বাচন সঠিক না হলে অর্থনৈতিক ক্ষতি ও উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মানের উপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। নিয়মিত বিরতিতে গবেষণাগারে বিশ্লেষণ করে মাটিতে কোনো ক্ষতিকর উপাদান

থাকলে তা নিশ্চিত হয়ে ফসল উৎপাদন করতে হবে। খামারের জমি কখনো অকৃষি কাজে ব্যবহার করতে দেওয়া যাবে না, এতে অণুজীব ও বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের সংক্রমণ হতে পারে।

২) চাষাবাদের পরিবেশ ও চাষ পদ্ধতি

আবাদকৃত ফসল বা জাত অবশ্যই জলবায়ু, মাটি, বাজার চাহিদা এবং ফসল বিন্যাস এবং উৎপাদন লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। মানসম্পন্ন বীজ বা চারা উচ্চ অঙ্কুরোদগম, বিশুদ্ধ, সুষম ও জীবনীশক্তি সম্পন্ন এবং অবশ্যই অনুমোদিত ও বিশ্বস্ত উৎস হতে সংগ্রহ করতে হবে এবং ক্রয় ও পরিবহন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে। ফসল বা জাত নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান রোগ ও পোকামাকড়-এর বিরুদ্ধে মধ্য হতে উচ্চ মাত্রায় প্রতিরোধী/সহনশীল, সুস্বাদু, দীর্ঘ সেলফ লাইফ, বাজারে প্রতিযোগিতা করা এবং পরিবহনজনিত আঘাত/চাপ মোকাবিলার ক্ষমতার বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে। মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সারের মাত্রা ঠিক করতে হবে। জৈব পদার্থ/গোবর বা মানুষের মলমূত্র কাঁচা ব্যবহার করা যাবে না, প্রাকৃতিক সার ও মুরগির বিষ্ঠা অবশ্যই ভালোভাবে পচানো হতে হবে। সারের পরিমাণ ও প্রয়োগবিধি সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৩) পানির গুণাগুণ ও সেচ

পানির গুণাবলি সতেজ ফল ও সবজির অণুজৈবিক সংক্রমণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফসলের চাহিদা অনুসারে সেচ প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেচ কম বা বেশি হলে ফসল উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। তাই সঠিক পদ্ধতিতে পরিমিত মাত্রায় সেচ প্রদান করতে হবে।

৪) শস্য সংরক্ষণ

ফসল সংরক্ষণে স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশবান্ধব সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অবলম্বন করা উত্তম। সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা ফলপ্রসূ না হলে অনুমোদিত মাত্রায় ও সঠিক পদ্ধতিতে কীটনাশক ও বালাইনাশক প্রয়োগ করা যাবে। কার্যকর পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণে সঠিক কীটনাশক ও বালাইনাশক নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কীটনাশক নির্বাচনের পূর্বে আক্রান্ত পোকা রোগবালাই অবশ্যই চিহ্নিত করতে হবে। অনুমোদিত মাত্রায়, সঠিক অবস্থায়, অবশ্যই সকল নিয়ম-কানুন, প্রয়োগবিধি ও বিরতি অনুসরণ করে শুধু প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারাই কীটনাশক ও বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে। কীটনাশকের মিশ্রণ ভালো মানের পরিষ্কার পানি ব্যবহার করে নির্ধারিত, নিরাপদ ও বায়ু চলাচল করে এমন স্থানে তৈরি করতে হবে।

৫) ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ফসল সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও গুদামজাতকরণের সঠিক সময় ও পদ্ধতির উপর উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান মূলত নির্ভর করে। পরিপক্কতা সূচক (maturity index) নির্ণয় করে ফসল সংগ্রহ বা কর্তন করা হলে উৎপাদিত পণ্য গুণ ও মানসম্পন্ন হয়। ফসল সংগ্রহের সময় কীটনাশক ও বালাইনাশকের প্রি-হারভেস্ট ইনটারভেল ও উইথড্রল প্রিয়ড (ফসলে কীটনাশক প্রয়োগের পর সংগ্রহ ও বিষক্রিয়া অতিক্রমের সময়সীমা) অতিক্রমের নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৬) তথ্য সংগ্রহ বিষয়ে জিএপি-এর নির্দেশনা

উৎপাদন এবং সংগ্রহোত্তর কার্যক্রম বিষয়ে স্বচ্ছ, নির্ভুল এবং সর্বশেষ তথ্যাদি অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে। এমন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে যাতে যে কোনো নির্দিষ্ট কার্যক্রমের খামার হতে বিক্রয় পর্যন্ত সকল তথ্য অনুসরণ করা সম্ভব হয়। এসব তথ্য কমপক্ষে দুই বছর সংরক্ষণ করতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বালাই ব্যবস্থাপনা

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম): প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বালাই ব্যবস্থাপনা বা সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা হলো উদ্ভিদ সংরক্ষণের এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সম্ভবপর সব রকম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, যেমন- প্রাকৃতিক, জৈবিক, কৃষি পরিচর্যা, যান্ত্রিক, আইনগত, রাসায়নিক প্রভৃতির সমন্বয় সাধন ও প্রয়োগ করে এবং কৃষি পরিবেশের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াকে ন্যূনতম পর্যায়ে রেখে বালাইসমূহকে অর্থনৈতিক ক্ষতিকর মাত্রার নিচে রাখে।

বালাই নিয়ন্ত্রণের সাধারণ নীতি

বালাইসমূহকে একেবারে উচ্ছেদ বা প্রতিরোধ না করে তাদের সংখ্যা কমানো বালাই নিয়ন্ত্রণের একটি যুক্তিসঙ্গত নীতি। এতে অন্তত কিছু সংখ্যক বালাইকে পরিবেশে রেখে দিলে পরিবেশের ভারসাম্যের পাশাপাশি ফসলের কীটপতঙ্গ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও পোকামাকড়ের প্রাকৃতিক শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উপযুক্ত দমন ব্যবস্থা নিলেই যে অধিক ফসল পাওয়া যাবে বা লাভ হবে তা ঠিক নয়। কেননা অনেক সময় বালাই দমনে যে খরচ হয় তা বালাই দমনের ফলে প্রাপ্ত বাড়তি শস্যের মূল্যের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। বালাই নিয়ন্ত্রণে সর্বদা এমন নীতি গ্রহণ করা উচিত যাতে কৃষি পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট না হয় এবং অধিক খরচ না পড়ে। এজন্য যথাসম্ভব কৃষি পরিচর্যা, জৈবিক দমন ও পোষক প্রতিরোধের মাধ্যমে সর্বদা সমন্বিত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার (আইপিএম) উপাদানসমূহ

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার (আইপিএম) উপাদানসমূহ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে এবং আইপিএম বালাই ব্যবস্থাপনার যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি নির্বাচন এবং এদের যথোপযোগী ব্যবহারকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বালাই ব্যবস্থাপনার নির্বাচিত পদ্ধতি কার্যকর, বাস্তবসম্মত, অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক এবং পরিবেশসম্মত হতে হবে। একটি উপযুক্ত কৌশল নির্বাচনের জন্য একজনকে ক্ষতিকর পোকার জীবনচক্র এবং আচরণ, পোকার আক্রমণ ক্ষতির কারণ হবে কিনা তা বুঝতে হবে এবং তাকে বিভিন্ন ধরনের সম্ভাব্য পদ্ধতি তুলনাপূর্বক উপযোগী আইপিএম পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে হবে।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার (আইপিএম) বিভিন্ন উপাদান নিচে দেওয়া হলো:

১. সঙ্গনিরোধ এবং আইনগত

এ প্রক্রিয়ায় সরকারি আইনসমূহ প্রয়োগ করা হয় এবং এর আওতায় বীজ এবং আক্রান্ত গাছ বা গাছের অংশ দেশে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না অথবা দেশের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিতে দেওয়া হয় না। একে বলা হয় সঙ্গনিরোধ পদ্ধতি এবং ইহা দুই ধরনের, যেমন- দেশের অভ্যন্তরীণ সঙ্গনিরোধ এবং বৈদেশিক সঙ্গনিরোধ।

২. পরিচর্যাগত

পরিচর্যাগত পদ্ধতি হচ্ছে নিয়মিত খামার কার্যক্রম পরিচালনা, যাতে ক্ষতিকর বালাইসমূহ ধ্বংস হয় অথবা এরা আর্থিক ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকে। বিভিন্ন পরিচর্যাগত পদ্ধতির মধ্যে ফসল এবং জাত নির্বাচন, বপনের সময় এবং পদ্ধতি, ভূমি কর্ষণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ, সেচ এবং সার প্রয়োগ, ফসল সংগ্রহের সময় ও পদ্ধতি এবং ফসল না থাকার সময়ে মাঠ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ব্যবস্থাপনায় ক্ষতিকর পোকা সহযোগিতা করে থাকে।

৩. কৌলিতাত্ত্বিক প্রতিরোধী জাত ব্যবহার

উচ্চ ফলন ক্ষমতাসম্পন্ন পোকা প্রতিরোধী/সহনশীল জাত নির্বাচন করতে হবে। পোকা প্রতিরোধী জাতের ব্যবহার অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত দিক বিবেচনায় সুবিধাজনক।

৪. ভৌতিক

এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন যন্ত্র/পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে পোকাকে শারীরিকভাবে বাধাগ্রস্ত করে পোকার সংখ্যা কমিয়ে রাখা হয়।

গরম ও ঠান্ডা তাপমাত্রা প্রয়োগঃ শুষ্ক তাপ প্রয়োগ অথবা সূর্যের আলোতে শুকানোর মাধ্যমে গরমকাল বিশেষত এপ্রিল-জুন মাসে বীজ এবং গুদামজাত পণ্যের অনেক পোকাই নিধন করা সম্ভব। বিভিন্ন ধরনের তাজা ও শুকনা ফল হিমাগারে গুদামজাত করলে মাছি পোকা, আলুর সুতলি পোকা এবং অনেক রোগ-জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ফল বা সবজি ১০° সে. এর নিচের তাপমাত্রায় রাখা হলে ফলের মাছি পোকার কিড়া মারা যায়।

আর্দ্রতাঃ বাতাসের আর্দ্রতা হ্রাসের প্রতি পোকামাকড় খুবই সংবেদনশীল, কিন্তু মাঠে বাতাসের আর্দ্রতার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটানো সাধারণত সম্ভবপর নয়।

আলোক ফাঁদঃ কৃত্রিমভাবে উৎপাদিত রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার শুরুর আগে আলোক ফাঁদের সাহায্যে বিভিন্ন মথ ও প্রজাপতি বিপুল সংখ্যায় আকৃষ্ট করে মেরে ফেলে পোকা দমন করা হতো। এ ধরনের ফাঁদ এখনও কোনো একটি এলাকার প্রধান প্রধান ক্ষতিকারক পোকার উপস্থিতি নির্ণয়ের কাজে উপযোগী।

৫. যান্ত্রিক

হাত ব্যবহারের মাধ্যমে পোকার সংখ্যা কমানোর জন্য নিম্নলিখিত যান্ত্রিক পদ্ধতিগুলোর ব্যবহার হয়ে থাকে।

হাত বাছাইঃ বড়, সুস্পষ্ট, পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ পোকাসমূহকে হাত বাছাইয়ের মাধ্যমে ধ্বংস করা একটি প্রাচীন পদ্ধতি যা কিছু নির্দিষ্ট অবস্থার প্রেক্ষাপটে কার্যকর।

পর্দা ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার মাধ্যমে পোকাকে দূরে রাখাঃ ৩০-৬০ সে. মি. গভীর পরিখা খননের মাধ্যমে এবং জমির চারপাশে ৩০ সে. মি. উঁচু টিনের বেড়া দিয়ে উড়ন্ত পঙ্গপালসহ বিভিন্ন ধরনের বিছা পোকার আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

ফাঁদ এবং সাকশন যন্ত্রের মাধ্যমেঃ ক্ষতিকর পোকা সংগ্রহের বিভিন্ন ধরনের যান্ত্রিক উপায় রয়েছে। উপযুক্ত টোপের মাধ্যমে তাদেরকে এমন ফাঁদে/খাঁচায় ফেলা হয় যেখান থেকে তাদের বের হওয়া কঠিন।

ডালপালা ছাঁটাই এবং পায়ে পিষে মেরে ফেলা: আক্রান্ত ডগা এবং ফুলের অংশ ছাঁটাই ও ধ্বংসের মাধ্যমে আঙ্গুর, সাইট্রাস, বরই, আতা ও ডুমুর আক্রমণকারী বিভিন্ন ধরনের স্কেল, মিলিবাগ এবং গলমাছি পোকা কার্যকরভাবে দমন করা সম্ভব।

৬. জৈবিক

স্মিথ ১৯১৯ সালে প্রথম জৈবিক দমন কথাটি ব্যবহার করেন যার উদ্দেশ্য ছিল ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমনের জন্য প্রাকৃতিক শত্রুসমূহের ব্যবহারের গুরুত্ব তুলে ধরা।

প্রাকৃতিক উপায়ে দমন: বিভিন্ন বায়োটিক এবং এবায়োটিক উপাদানের সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষতিকর পোকার সংখ্যা একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় সীমিত রাখাকে প্রাকৃতিক দমন বলা হয়ে থাকে।

পরজীবী (প্যারাসিটয়েড): এরা সাধারণত পোষক পোকার চেয়ে আকারে অনেক ছোট, এরা পোষককে মেরে ফেলে ও একটি মাত্র পোষকের মাধ্যমে অপ্রাপ্ত অবস্থা সম্পন্ন করে এবং পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় মুক্তভাবে জীবনযাপন করে। ব্রাকনিড বোলতা একটি কার্যকর প্যারাসিটয়েডের ভালো উদাহরণ।

পরভোজী পোকা: একটি পরভোজী পোকা সাধারণত মুক্তভাবে জীবন ধারণ করে। এরা পোষককে মেরে ফেলে এবং সাধারণত পোষকের চেয়ে আকারে বড় হয় এবং তাদের জীবনচক্র সম্পন্ন করতে সাধারণত একাধিক পোষকের প্রয়োজন হয়। লেস উইং, লেডিবার্ড বিটল, প্রেয়িং ম্যান্টিড ইত্যাদি পরভোজী পোকার ভালো উদাহরণ।

রোগজীবাণু ব্যবহারের মাধ্যমে: তিনটি পদ্ধতিতে অণুজীব ব্যবহারের মাধ্যমে রোগ সৃষ্টি করে পোকা দমন করা যায়।

অণুজীব প্রতিষ্ঠাকরণ: এ পদ্ধতিতে ক্ষতিকর পোকার আবাসস্থলে রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব অবমুক্ত করে প্রতিষ্ঠা করা হয়, পরে যা নিজে থেকেই উক্ত এলাকায় বিস্তৃতি লাভ করতে পারে। নির্দিষ্ট সময় পর পর রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব অবমুক্ত করাকে মৌসুমি প্রতিষ্ঠাকরণ বলা হয়ে থাকে।

অণুজীব সংরক্ষণ: এই পদ্ধতি বলতে পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে অণুজীবের সংখ্যা বৃদ্ধিকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। পরিচর্যাগত পদ্ধতি পরিবর্তন অথবা পরিবেশের উন্নয়নের মাধ্যমে কোনো এলাকার বিভিন্ন বালাইয়ের রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবসমূহের সংখ্যা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

অণুজীব কীটনাশক: এই পদ্ধতি বলতে বিপুল সংখ্যায় অণুজীব বৃদ্ধি করানোকে বোঝানো হয়ে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক কীটনাশকের প্রয়োগের মতো পোকার আবাসস্থলে বিপুল সংখ্যায় অণুজীব প্রয়োগ করা হয়। ব্যাকুলোভাইরাস, ব্যাসিলাস থুরিনজাইএনসিস, বিউভেরিয়া, রেবডিটিস ইত্যাদি অণুজীব কীটনাশকের উদাহরণ।

জীব প্রযুক্তিগত

আধুনিক উদ্ভিদ জীবপ্রযুক্তির তিনটি উপাদান স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়েছে :

- রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি;
- মনোক্লোনাল এন্টিবডি উৎপাদন;
- সেল এবং টিস্যু কালচার ।

এই তিনটি পদ্ধতির সমন্বয়ই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মূল ভিত্তি। বিভিন্ন ফসল উন্নয়নে উদ্ভিদ জীব প্রযুক্তির উপযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গতানুগতিক প্রজনন (ব্রিডিং) পদ্ধতিতে হাইব্রিডাইজেশন-এর মাধ্যমে এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে সফলতার সাথে জিন স্থানান্তর করা হয়েছে। বন্য প্রজাতিসমূহ বিভিন্ন বায়োটিক ও এবায়োটিক প্রতিকূলতা প্রতিরোধী জিনের খুব গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বন্য প্রজাতির ধান *Oryza nivara থেকে* গ্রাসি স্টান্ট ভাইরাস প্রতিরোধী জিন এবং *Oryza officinalis* থেকে সাদা পিঠ গাছ ফড়িং প্রতিরোধী জিন সফলতার সাথে স্থানান্তর করা হয়েছে।

৭. উদ্ভিজ্জ

প্রায় ২,১২১ ধরনের উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে ক্ষতিকর পোকামাকড় দমনের গুণাগুণ রয়েছে। তবে আদর্শ উদ্ভিজ্জ কীটনাশক হতে হলে উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহকে উচ্চ কীটনাশক গুণসম্পন্ন হওয়া ছাড়াও নিম্নলিখিত গুণাবলি থাকা প্রয়োজন :

- এরা উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনের জন্য নিরাপদ হবে;
- এরা পরিবেশে স্থায়ী হবে না কিন্তু কার্যকর অবশিষ্টাংশ সম্পন্ন হতে হবে;
- এদের মূল উপাদানসমূহ অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক পদ্ধতিতে আলাদা করা যাবে;
- এদের উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ একই রকম গুণাবলি সম্পন্ন হবে (যেমন- নিম, চিনাবেরি, তামাক, পনগ্রাম, শরিফা ইত্যাদি।

৮. রাসায়নিক

কৃষিকাজে রাসায়নিক বালাইনাশক বিভিন্ন বালাই, যেমন- পোকামাকড়, ইঁদুরজাতীয় প্রাণী, আগাছা, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ইত্যাদি দমনের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। রাসায়নিক পদ্ধতিতে বালাই ব্যবস্থাপনায় অনেক ধরনের পদার্থ ব্যবহৃত হতে পারে। কোনোটি বালাইসমূহকে বিভ্রান্ত করে, আবার কোনোটি আগাছার সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বা কীটপতঙ্গের খোলস পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। অন্যদিকে কিছু উদ্ভিদজাতসহ সকল প্রচলিত রাসায়নিক কীটনাশকসমূহ জীবন্ত প্রাণিকুলের উপর সার্বিকভাবে বিষাক্ত। বালাইনাশকের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে 'বালাই ধ্বংসকারী'। নির্দিষ্ট শ্রেণির বালাইনাশককে উক্ত শ্রেণির নামে অভিহিত করা হয়, যেমন- কীটপতঙ্গ ধ্বংসকারীকে কীটনাশক, আগাছা ধ্বংসকারীকে আগাছানাশক, ছত্রাক ধ্বংসকারীকে ছত্রাকনাশক, মাকড় ধ্বংসকারীকে মাকড়নাশক ইত্যাদি। তবে এর ক্ষতিকারক দিকসমূহ, যেমন- বিভিন্ন বালাইয়ের সাধারণভাবে ব্যবহৃত বালাইনাশকসমূহের উপর প্রতিরোধী ক্ষমতা গড়ে তোলা, বিভিন্ন অপ্রধান বালাইয়ের প্রধান বালাই হিসেবে পুনরুত্থান, খাদ্য, পশুখাদ্য, মাটি, পানি, বাতাস ইত্যাদিতে বালাইনাশকসমূহের অবশিষ্টাংশের উপস্থিতির ফলে মানুষের স্বাস্থ্যহানি ও পরিবেশ বিপর্যয় ইত্যাদি বিবেচনা করে আইপিএম-এর সর্বশেষ ধাপ হিসেবে এটির ব্যবহার করা উচিত।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) এর সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

আইপিএম-এর সুবিধাসমূহ

- সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পোকামাকড় বা রোগবালাই কার্যকরী ও টেকসইভাবে দমন করা সম্ভব যা এককভাবে রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহার করে সম্ভবপর নয়।

- বালাইনাশকের ব্যবহার কম হওয়ার কারণে মাঠ শ্রমিক/কৃষক/ভোক্তাদের স্বাস্থ্যহীনতার ঝুঁকি কমে যাবে।
- রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার কম হওয়ার কারণে ফসলের জমির ক্ষয় ও অনুর্বর হয়ে যাওয়া হ্রাস পাবে।
- রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার কম হওয়ার কারণে কৃষকের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে।
- আইপিএম কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে দীর্ঘমেয়াদে ফসলের জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং সর্বোপরি ফসলসমূহ টেকসইভাবে বালাইয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবে।
- যে সমস্ত ক্ষেত্রে রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার কার্যকর নয় সে সব ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদে ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমনের জন্য আইপিএম পদ্ধতিই একমাত্র সমাধান।

আইপিএম-এর অসুবিধা/ সীমাবদ্ধতাসমূহ

- বালাই দমনের গতানুগতিক পদ্ধতির তুলনায় আইপিএম পদ্ধতি ব্যবহারে সময় ও শ্রম বেশি লাগে।
- আইপিএম পদ্ধতি সফলভাবে ব্যবহার করার জন্য কোনো এলাকার কৃষকদের সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন হয়।
- বালাই দমনের গতানুগতিক পদ্ধতির তুলনায় আইপিএম পদ্ধতি ব্যবহারের প্রাথমিক খরচ বেশি হতে পারে।

ফেরোমন ফাঁদের মাধ্যমে পোকা দমন পদ্ধতি

পুরুষ পোকাকে প্রজনন কাজে আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন ধরনের স্ত্রী পোকা এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ নির্গত করে যা সেক্স ফেরোমন নামে পরিচিত। সেক্স ফেরোমনের গন্ধে পুরুষ পোকা আকৃষ্ট হয় এবং স্ত্রী পোকার সাথে মিলিত হয় এবং পোকার বংশবৃদ্ধি ঘটায়।

বর্তমানে স্ত্রী পোকা কর্তৃক নিঃসৃত এমনই কয়েক ধরনের কৃত্রিম সেক্স ফেরোমন আবিষ্কৃত হয়েছে, যা বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন ও সহজলভ্য করা হয়েছে। সেক্স ফেরোমনের গন্ধ দিয়ে তৈরি টোপ বা লিউর ঝুলিয়ে রেখে আকৃষ্ট পুরুষ পোকাকে আটকানো ও পরে মেরে ফেলার জন্য বিভিন্ন ধরনের পোকা ধরার ফাঁদ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীগণ সহজলভ্য দ্রবাদি দিয়ে তৈরি 'বারি ফাঁদ' নামে এক ধরনের ফাঁদ উদ্ভাবন করেছেন, যা অত্যন্ত সস্তা ও পোকা ধরার কাজে অত্যন্ত কার্যকরী। চমকপ্রদ কার্যকারিতার জন্য কৃষকদের মাঝে এটি 'জাদুর ফাঁদ' নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

চিত্রঃ করলার ক্ষেত

- 'বারি ফাঁদ'-এর আকার সাধারণত ২০-২৪ সে.মি. লম্বা, ১২-১৫ সে.মি. দৈর্ঘ্য ও ১০-১২ সে.মি. প্রস্থ চার কোণাকার বা গোলাকৃতি উন্নতমানের (পিভিসি গ্রেন হতে তৈরি) প্লাস্টিকের তৈরি পাত্র (বৈয়াম)।
- ফাঁদটি অবশ্যই স্বচ্ছ সাদা প্লাস্টিকের তৈরি হতে হবে, পাত্রের কোনো অংশে রং ব্যবহার করলে পোকা ধরার পরিমাণে হেরফের হবে। তবে প্লাস্টিকের পাত্রের মুখ যে কোনো রঙের (লাল, হলুদ, সবুজ) হতে পারে।
- ফাঁদের ভিতর পোকা ঢোকার সুবিধার্থে পাত্রের তলা হতে ৫-৬ সে.মি. উপরে পাত্রের উভয় পার্শ্বে ত্রিকোণাকারভাবে কাটা (ভূমি ৭-৮ সে.মি. ও উচ্চতা ৭-৮ সে.মি.)।

চিত্র: বাঁধাকপির ক্ষেত

- ফেরোমন টোপটি পানি ফাঁদের প্লাস্টিক পাত্রের মুখ হতে ৩-৪ সে.মি. নিচে একটি সরু তার দিয়ে স্থাপন করতে হয়।
- ফাঁদ পাতা অবস্থায় সব সময় পাত্রের তলা থেকে ৩-৪ সে.মি. উচ্চতা পর্যন্ত সাবান মিশ্রিত পানি রাখতে হবে। খেয়াল রাখা প্রয়োজন যে পাত্রের তলায় রক্ষিত সাবান পানি যেন শুকিয়ে না যায়।

বর্তমানে বাংলাদেশে ৪ (চার) ধরনের পোকা দমনের জন্য সেক্স ফেরোমনের ফাঁদ বিভিন্ন ফসলে, যেমন- বেগুন, বিভিন্ন কুমড়াজাতীয় ফসল (১৬টি), বাঁধাকপি, ফুলকপি, শিম, মরিচ, সরিষা, আম, পেয়ারা ইত্যাদি ফসলে ব্যবহৃত হচ্ছে। সাধারণত ফেরোমনের ফাঁদ সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, পোকা দমনে ফেরোমনের ফাঁদভিত্তিক সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগের চেয়ে অনেক বেশি অর্থসাশ্রয়ী, কার্যকর এবং পরিবেশবান্ধব। ফেরোমন ফাঁদ নির্দিষ্ট দূরত্বে ফসলের প্রাথমিক অবস্থায় জমিতে স্থাপন করতে হবে। সাধারণত একটি ফেরোমন টোপ ৫০-৬০ দিন পর্যন্ত কার্যকর থাকে বলে ব্যবহারের ৬০ দিন পর প্রয়োজন অনুসারে পুরাতন টোপ পরিবর্তন করে নতুন ফেরোমন টোপ ব্যবহার করতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের ফল পরিচিতি

আম

বাংলাদেশে যে সব ফল উৎপন্ন হয় তার মধ্যে আমের জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি। আমের নানাবিধ ব্যবহার, স্বাদ-গন্ধ ও পুষ্টিমানের জন্য এটি একটি আদর্শ ফল হিসেবে পরিচিত। তাই আমকে ফলের রাজা বলা হয়। আম গাছের পাতা চির সবুজ, সরল ও কচি পাতা লালচে গোলাপি। যেসব দেশে আম উৎপন্ন হয় তার মধ্যে আছে ভারত, চীন, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আমেরিকা ও আফ্রিকা।

আম চাষের উপযুক্ত জমি ও মাটি

উর্বর দোআঁশ উঁচু ও মাঝারি জমি আম চাষের জন্য উপযোগী। বাগান আকারে আমের চাষ করতে হলে প্রথমে নির্বাচিত জমি ভালোভাবে আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে সমতল ও আগাছামুক্ত করে নিতে হবে। জমি উত্তমরূপে কর্ষণ করলে গাছের শিকড় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। মাটি ও আবহাওয়ার কারণে দেশের সব জেলাতে সব জাতের আম হয় না। আমের জন্য মাটির অম্লতা দরকার ৫.৫-৭.০। সুতরাং কাঙ্ক্ষিত জাতটি নির্বাচিত জায়গায় হবে কিনা তা বিবেচনায় রাখতে হবে। গভীর, সুনিষ্কাশিত, উর্বর দোআঁশ মাটি আম চাষের জন্য ভালো। বর্ষায় পানি দাঁড়ায় না এমন উঁচু বা মাঝারি উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে।

চিত্র: আম

চারা রোপণ

জ্যৈষ্ঠ থেকে আষাঢ় (মধ্য মে থেকে মধ্য জুলাই) এবং ভাদ্র-আশ্বিন মাস (মধ্য আগস্ট থেকে মধ্য অক্টোবর) চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে সেচের সুবিধা থাকলে শীতকাল ছাড়া বছরের যে কোনো সময় চারা রোপণ করা যাবে। কয়েকবার চাষ ও মই দিয়ে জমি সমতল এবং আগাছামুক্ত করতে হবে। রোপণ-এর দূরত্ব নির্ভর করে আমের জাতের উপর। জাতভেদে আম গাছের রোপণ দূরত্ব ৬ × ৬ মিটার; ১০ × ১০ মিটার এবং ১২ × ১২ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। বর্গাকার, আয়তাকার, ত্রিভুজাকার বা ষড়ভুজাকার যে প্রণালিতে চারা রোপণ করা হোক না কেন, গাছ লাগানোর স্থানটি চিহ্নিত করে বর্ষা শুরুর আগেই সেখানে গর্ত করতে হবে। ষড়ভুজি পদ্ধতিতে আম চারা রোপণ করলে ১৫ ভাগ চারা বেশি রোপণ করা যায়। সাধারণত মে-জুন মাসে ৭৫-১০০ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতায় গর্ত করতে হবে। গর্ত করার সময় গর্তের উপরের অর্ধেক অংশের মাটি এক পাশে এবং নিচের অংশের মাটি অন্য পাশে রাখতে হবে। গর্ত থেকে মাটি উঠানোর পর ১০ দিন পর্যন্ত গর্তটিকে রোদে শুকাতে হবে। এরপর প্রতি গর্তে ১০ কেজি গোবর সার, ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমপি, ২৫০ গ্রাম জিপসাম, ৫০ গ্রাম জিংক সালফেট এবং ১০ গ্রাম বোরিক এসিড উপরের অংশের মাটির সাথে মিশিয়ে মাটি ওলট-পালট করে গর্ত ভরাট করতে হবে। গর্তভরাটের সময় উপরের অর্ধেক অংশের মাটি দিয়ে গর্ত ভরাট না হলে প্রয়োজনে পাশ থেকে উপরের মাটি গর্তে দিতে হবে। সুস্থ-সবল ও রোগমুক্ত চারা রোপণ করলে কাঙ্ক্ষিত ফলন পাওয়া যায়। রোপণের জন্য ৪-৫ ফুট উচ্চতাসম্পন্ন ২-৩টি ডাল বিশিষ্ট চারা নির্বাচন করতে হবে। ২-৩ বছর বয়সী ফাটল/ভিনিয়ার কলমের চারা বাগানে লাগানোর জন্য ভালো। গর্ত

ভর্তি করার ১০-১৫ দিন পর পুনরায় গর্তের মাটি ভালোভাবে ওলট-পালট করে গর্তের মাঝখানে চারাটি সোজাভাবে লাগিয়ে তারপর চারদিকে মাটি দিয়ে গাছের গোড়া সামান্য চেপে দিতে হবে। চারা রোপণের সময় চারার গোড়ার বলটি যেন ভেঙে না যায় এবং চারার গোড়াটি প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাটির নিচে ঢুকে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। রোপণের পর চারাটি খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। বিকেল বেলায় চারা/কলম রোপণ করা ভালো। রোপণের পর বৃষ্টি না থাকলে কয়েক দিন সেচ দিতে হবে।

চারা বা কলম তৈরি

সরাসরি বীজ বা আঁটি থেকে চারা তৈরি করা যায়। পূর্ণভাবে পাকা ফলের আম থেকে আঁটি সংগ্রহ করে প্রথম বীজতলার মাটিতে বসাতে হবে। বীজতলায় ২০ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার দূরে দূরে আঁটিগুলো সারি করে বসানোর পর আঁটির উপরে আলগা ঝুরা মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। একটা আঁটি থেকে যে চারা গজাবে সে চারাগুলোকে শিকড়সহ সাবধানে কেটে আলাদা করে দ্বিতীয় বীজতলায়, টবে বা বড় পলিব্যাগে গোবর মিশানো মাটিতে বসাতে হবে। এক বছর বয়স হলে সে সব চারা বাগানে লাগানোর উপযুক্ত হবে। জ্যৈষ্ঠ থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত চারা তৈরির উপযুক্ত সময়। তবে মনে রাখতে হবে যে, আঁটি থেকে প্রাপ্ত গাছ হতে ফল পেতে সাত-আট বছর লেগে যেতে পারে। মাত্র দুই-তিন বছরে ফলন পেতে কলমের চারা গাছ লাগানোই ভালো। কলম করতে চাইলে মাঝারি আকারের গাছ হয় এমন কোনো দেশি জাতের আমের আঁটি থেকে প্রথমে চারা তৈরি করে নিতে হবে। তাই নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কলম তৈরি করে গাছ রোপণের এক থেকে দুই বছর পর থেকেই ফল ধরতে শুরু করে।

সার ব্যবস্থাপনা

আম বাগানে সার প্রয়োগের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। প্রতিটি গাছে বছরে কী পরিমাণ সার দিতে হবে তা নির্ভর করে মাটির গুণাগুণের উপর। গাছ বাড়ার সাথে সাথে সারের চাহিদাও বাড়তে থাকে। বছর অনুযায়ী সারের পরিমাণ দেওয়া হলো-

রোপণের এক বছর পর ২০ কেজি গোবর সার দিতে হবে। প্রতিবছর বাড়াতে হবে ৫ কেজি করে এবং ২০ বছর ও এর ঊর্ধ্বে গাছের ক্ষেত্রে ১২৫ কেজি গোবর সার প্রয়োগ করতে হবে। এভাবেই রোপণের এক বছর পর ইউরিয়া ২৫০ গ্রাম এবং প্রতিবছর বাড়াতে হবে ১২৫ গ্রাম করে। এভাবে ২০ বছর ও এর ঊর্ধ্বে গাছের ক্ষেত্রে ২৭৫০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে। রোপণের এক বছর পর ১০০ গ্রাম টিএসপি প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবছর বাড়াতে হবে ১০০ গ্রাম করে এবং ২০ বছর ও এর ঊর্ধ্বে ২১৫০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে। রোপণের এক বছর পর ১০০ গ্রাম এমওপি প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবছর বাড়াতে হবে ১০০ গ্রাম করে এবং ২০ বছর ও এর ঊর্ধ্বে ২১০০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে। রোপণের এক বছর পর ১০০ গ্রাম জিপসাম দিতে হবে। প্রতিবছর বাড়াতে হবে ৭৫ গ্রাম করে এবং ২০ বছর ও এর ঊর্ধ্বে ১৬০০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে। রোপণের এক বছর পর ১০ গ্রাম জিংক সালফেট দিতে হবে। প্রতিবছর বাড়াতে হবে ৫ গ্রাম করে এবং ২০ বছর ও এর ঊর্ধ্বে গাছের ক্ষেত্রে ১১০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে। রোপণের এক বছর পর ৫ গ্রাম বোরিক এসিড দিতে হবে। প্রতিবছর বাড়াতে হবে ২ গ্রাম করে এবং ২০ বছর ও এর ঊর্ধ্বে ৫০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে।

সব সার দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করা ভালো। প্রথম অর্ধেক বর্ষার আগে এবং বাকিটা আশ্বিন মাসে অর্থাৎ বর্ষার পরে। ফলন্ত গাছে গুঁড়ি থেকে ২-৩ মিটার দূরত্বে ৩০ সে.মি. প্রশস্ত ও ১৫-২০ সে.মি. গভীর করে চক্রাকার নালা কেটে তার ভিতর রাসায়নিক ও জৈবসার মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। অথবা দুপুর বেলায় যতটুকু জায়গায় গাছের ছায়া পড়ে ততটুকু জায়গায় সার ছিটিয়ে কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে

ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। আম বাগানে জৈব পদার্থের ঘাটতি থাকলে বৈশাখ চাষ করতে হবে। এতে বাগানে জৈব পদার্থসহ অন্যান্য সার যোগ হলে মাটির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

সেচ ব্যবস্থাপনা

আম বাগানে নিয়মিত সেচ দিতে হবে। তবে মাটিতে রস থাকলে সেচের দরকার হবে না। গবেষণায় দেখা গেছে, আম গাছে গোড়ার চারদিকে এক মিটার জায়গা সামান্য উঁচু রেখে দুপুর বেলায় যতটুকু জায়গায় গাছের ছায়া পড়ে ততটুকু জায়গায় একটি থালার মতো করে বেসিন তৈরি করে সেচ দিলে পানির পরিমাণ কম লাগে এবং বেশির ভাগ পানি গাছ গ্রহণ করতে পারে। বেসিন পদ্ধতির আরেকটি সুবিধা হলো গাছের গোড়া পরিষ্কার থাকে, ফলে আগাছা জন্মাতে পারে না। সেচ দেওয়ার পর জায়গাটি কচুরিপানা দিয়ে ঢেকে দিলে মাটিতে এক মাস পর্যন্ত রস থাকবে। তবে আম গাছে ফুল আসার এক মাস আগে সেচ না দেয়াই ভালো। এ সময় সেচ দিলে গাছে নতুন পাতা বের হবে, এতে মুকুলের সংখ্যা কমে গিয়ে ফলন কমে আসবে। ফলন্ত গাছে মুকুল বের হওয়ার ৩-৪ মাস আগে থেকে সেচ দেওয়া বন্ধ করতে হবে। তবে মুকুল ফোটার পর ও ফল মটর দানা হলে একবার বেসিন পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া দরকার।

বালাই ব্যবস্থাপনা

গাছে নতুন পাতা বের হলে পাতা কাটা উইভিল পোকা আক্রমণ করতে পারে। কচিপাতার নিচের পিঠে মধ্য শিরার উভয় পাশে স্ত্রী পোকা ডিম পাড়ে। পরে স্ত্রী পোকা ডিম পাড়া পাতাটির বোঁটার কাছাকাছি কেটে দেয়। শেষে গাছটি পাতাশূন্য হয়ে যায়। কর্তিত কচি পাতা মাটি থেকে সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। গাছে কচি পাতা বের হওয়ার ৬ দিন এবং ১২ দিন পর অনুমোদিত কীটনাশক নির্দেশিত মাত্রায় স্প্রে করতে হবে।

অনেক সময় গাছে পাউডারি মিল ডিউ বা সাদা গুঁড়া রোগ বেশি হয়। ছত্রাকজনিত এ রোগটি মুকুল ও মুকুলের ডাঁটিতে আক্রমণ করে সাদা পাউডারে ঢেকে ফেলে। এতে ফুল ও ছোট ফল পচে নষ্ট হয়, সব ঝরে পড়ে। মুকুল আসার পর থেকে ফল কলাইদানার মতো হওয়া পর্যন্ত এ রোগটি সাধারণত আক্রমণ করে। কুয়াশা হলে রোগটা বাড়ে। রোগের আক্রমণে দানা বেঁধে ও গুটি ঝরে যায়। তাই মুকুল আসার পরপরই ফুল ফোটার আগেই যে কোনো অনুমোদিত ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে। এছাড়া কাঁচা অবস্থায় আমের মুখ ছিদ্র করে একধরনের পোকা ভিতরে ঢুকে শাঁস ও কচি আঁটি খেয়ে নষ্ট করে দেয়। পাকার সময় আক্রমণ করে ফলের মাছি। ফল ছিদ্র করে শাঁস খেয়ে পাকা আম নষ্ট করে। তাই এসব পোকার আক্রমণ থেকে ফল রক্ষার জন্য অনুমোদিত কীটনাশক স্প্রে করতে হবে।

আম বাগানের আগাম পরিচর্যা

গবেষণায় দেখা গেছে, উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে একটু পরিচর্যা বা ব্যবস্থাপনা ঠিকমতো করতে পারলে ফলন কয়েক গুণ বাড়ানো যায়। আম সংগ্রহের পর রোগাক্রান্ত ও মরা ডালপালা একটু ভালো অংশসহ ধারালো ছুরি বা করাত দিয়ে কেটে ফেলতে হবে। ডালপালা এমনভাবে ছাঁটাই করতে হবে যেন গাছের ভিতর পর্যন্ত সূর্যের আলো পৌঁছাতে পারে। গাছের ভিতরমুখী ডালে সাধারণত ফুল ফল হয় না, তাই এ ধরনের ডাল কেটে

বাংলাদেশে আম পাকার সময়	
আমের নাম	পরিপক্কতার সময়
গোবিন্দভোগ, গুলাবখাস	২৫ মে এর পর
গোপালভোগ, রানিপছন্দ	১ জুনের পর
হিমসাগর, ক্ষীরশাপাতি, ল্যাংড়া	১২ জুনের পর
লক্ষ্মণভোগ, হাড়িভাঙ্গা	২০ জুনের পর
আম্রপলি, মল্লিকা, ফজলি	১ জুলাই থেকে
আশ্বিনা	২ জুলাই থেকে

ফেলতে হবে। বর্ষাকালে কাটা অংশগুলো থেকে নতুন কুশি গজাবে এবং পরের বছরে ঐ নতুন কুশিগুলোতে ফুল আসবে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, ডগার বয়স ৫ থেকে ৬ মাস না হলে ঐ ডগায় সাধারণত ফুল আসে না। আগামী বছরে একটি গাছে কী পরিমাণ ফলন আসতে পারে তা আগস্ট মাসেই ধারণা পাওয়া যায়। এ সময়ের মধ্যে গাছে যত বেশি নতুন ডগা গজাবে ততই ভালো। আম গাছে শতভাগ মুকুল আসা ভালো না। এতে ফলন ব্যাহত হয়। তাই শতভাগ মুকুলায়িত আম গাছের চারদিক থেকে ৫০% মুকুল ফোটার আগেই ভেঙে দিতে হবে। এতে ভাঙা অংশে নতুন কুশি গজাবে এবং পরবর্তী বছরে ঐ সব ডগায় ফুল আসবে, আম আসবে। গাছের গোড়া আগাছামুক্ত ও গাছের ডালপালা সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। কলমের গাছের বয়স ৪ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মুকুল ভেঙে দিতে হবে।

ফসল তোলা

গাছে আম যখন হলুদাভ রং ধারণ করা শুরু হয় তখন আম পরিপক্ক হয়েছে বলে জানা যায়। জাতভেদ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে আম পাকা শুরু হয়। আম পাকানোর জন্য কোনো ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য স্প্রে করার দরকার হয় না। জালিযুক্ত বাঁশের কৌটার সাহায্যে আম সংগ্রহ করলে তা অক্ষত থাকে এবং সংরক্ষণ সময় বৃদ্ধি পায়।

বাজারজাত করণ

আমাদের দেশে বেশ কিছু আমের জাত (ল্যাংড়া, খিরসাপাতি, হিমসাগর, ফজলী, গোপালভোগ ও বোম্বাই) রয়েছে যেগুলো রঙিন না হলেও স্থানীয় বাজারে এর চাহিদা বেশি। বিদেশের বাজারে রঙিন ও হালকা মিষ্টি আমের চাহিদা বেশি। আমের বাজারজাত করা হবে কোথায় তা নির্ধারণ করে বাগান তৈরি করতে পারলে লাভবান হওয়া যায় বেশি। আবার প্রতিবছর ফল পাওয়া যায় এমন জাতের বাগান করতে পারলেও বাজারে বিক্রি করে লাভবান হওয়া যায় ও নিজস্ব পুষ্টিচাহিদাও পুরণ হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিবছর ফল দিতে সক্ষম এমন কয়েকটি জাত উদ্ভাবন করছে। জাতগুলো হলো বারি আম-১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮। এ জাতের চারা দিয়ে বাগান করলে ভালো ফলন, পুষ্টিচাহিদা পূরণের পাশাপাশি লাভবান হওয়া যায়।

লিচু

চিত্রঃ লিচু

বাংলাদেশের রাজশাহী ও দিনাজপুরে লিচুর ভালো ফলন হয়। লিচুর আদিনিবাস চীনে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট লিচুর তিনটি জাত বের করেছে- বারি লিচু-১, বারি লিচু-২, বারি লিচু-৩। অন্য জাতসমূহ হলোঃ বোম্বাই, মাদ্রাজি, চায়না-৩, মঙ্গলবাড়ি, মোজাফফরপুরী, বেদানা লিচু। বোম্বাই লিচু টকটকে লাল, মাদ্রাজি আগাম জাত, সবচেয়ে ভালো জাত চায়না-৩। এই জাতের গাছে প্রতিবছরই ভালো ফল ধরে। বেদানা নাবি জাত। বারি লিচু-১ আগাম জাত, বারি লিচু-৩ মাঝ মৌসুমি জাত। কিন্তু বারি লিচু-২ নাবি জাত। লাগানোর জন্য এসব জাত থেকে যে কোনো জাত নির্বাচন করা যেতে পারে। লিচু গাছে তিন থেকে ছয় বছর পর ফল ধরে। তবে ২০-৩০ বছর বয়স পর্যন্ত লিচু গাছে ফলন বাড়তে থাকে। প্রতিটি গাছ থেকে বছরে ৮০-১৫০ কেজি বা ৩২০০-৬০০০টি লিচু পাওয়া যায়।

উপযোগী জলবায়ু ও মাটি

আর্দ্র আবহাওয়ায় লিচুর বৃদ্ধি ভালো হয়। পানি নিষ্কাশনের সুবিধা থাকলে লিচু গাছ সব ধরনের মাটিতেই জন্মাতে পারে। তবে উর্বর বেলে দো-আঁশ মাটি লিচুর জন্য উত্তম।

জমি তৈরি

উঁচু বা মাঝারি উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। চাষ ও মই দিয়ে জমি সমতল এবং আগাছামুক্ত করে নিতে হবে। বসতভিটায় দুইএকটি গাছ রোপণ করলে জমি তৈরি না করে সরাসরি গাছ রোপণের জন্য মাদা করলেই হবে।

বংশবিস্তার

লিচুর অযৌন বংশবৃদ্ধির জন্য গুটিকলম একটি উত্তম পদ্ধতি হিসেবে সর্বত্রই স্বীকৃত। রোগ ও পোকামাকড়মুক্ত সুস্থ গাছের এক বছর বয়সের ডালে গুটিকলম করা হয়। মে-জুন মাস লিচুর গুটিকলম বাঁধার উপযুক্ত সময়। শিকড় আসতে প্রায় দুই মাস সময় নেয়।

চারা নির্বাচন

এক বছর বয়স্ক সুস্থ ও সবল গুটিকলমের চারা বাছাই করতে হবে। বড় চারা রোপণ না করাই শ্রেয়।

চারা রোপণের সময়

মধ্য-মে থেকে মধ্য-জুলাই এবং মধ্য-আগস্ট থেকে মধ্য-সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত চারা রোপণ করা যেতে পারে।

সার প্রয়োগ ও চারা রোপণ

চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পূর্বে গর্ত করতে হবে এবং সার ও মাটি মিশিয়ে গর্ত ভর্তি করতে হবে। চারা রোপণের সময় সাবধানে চারাটি গোড়ার মাটির বলসহ গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগাতে হবে। চারা রোপণের পর পানি, খুঁটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। রোপণের ৬ মাস পরে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি গাছেই ইটের বা বাঁশের ঘের দেওয়া প্রয়োজন।

চারা কলম

বীজ থেকেও অঙ্গজ পদ্ধতিতে লিচুর চারা তৈরি করা যায়। কিন্তু বীজ থেকে উৎপাদিত গাছে ফল ধরতে ৭-১২ বছর সময় লাগে। এ জন্য বীজ থেকে সাধারণত চারা উৎপাদন করা হয় না। চারা উৎপাদনের জন্য গুটিকলম লিচুর ক্ষেত্রে সর্বাধিক উপযোগী। তবে এ পদ্ধতি ছাড়া জোড়কলম, কুঁড়ি সংযোজন, ছেদ কলম প্রভৃতির মাধ্যমে সফলভাবে চারা উৎপাদন করা যায়।

চাষাবাদ

পরিকল্পিতভাবে লিচুবাগান করতে পরিচ্ছন্নভাবে জমি তৈরি করে জমি সমান করতে হবে। মে-জুন মাসে জমি তৈরি করা ভালো। জমিতে বর্গাকার বা ষড়ভুজি রোপণ প্রণালি অনুসরণ করে ১০ মিটার দূরে দূরে ১ মিটার × ১ মিটার × ১ মিটার আকারের গর্ত খনন করতে হবে। রোপণের কয়েক সপ্তাহ আগে অর্থাৎ জুন-জুলাই মাসে গর্ত করা উচিত। গর্ত করার পর গর্তের উপরের মাটির সাথে গর্তপ্রতি ২০-২৫ কেজি জৈবসার, ২ কেজি হাড়ের গুঁড়ো বা ৫ কেজি কাঠের ছাই মিশিয়ে গর্ত ভরে দিতে হবে। তারপর তাতে পানি দিয়ে কিছু দিন রেখে দিয়ে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসের দিকে গর্তের মাটির সাথে ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া ও এমওপি মিশিয়ে গর্তের মাঝখানে লিচুর চারা বা গুটিকলম লাগাতে হবে। চারা রোপণের পর পানি, খুঁটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। রোপণের ৬ মাস পরে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি গাছেই ইটের বা বাঁশের ঘের দেওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজনবোধে কিছু পাতা ছাঁটাই করা ভালো। প্রতিবছর তিনবার অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি, মে ও অক্টোবর-নভেম্বরে সার প্রয়োগ করতে হবে। রোপণের বছর সার কম দিলেও বয়স বাড়ার সাথে সারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। সারের পরিমাণ হলো এক থেকে তিন বছর বয়সী গাছের জন্য গাছপ্রতি জৈবসার ১০-২০ কেজি, ইউরিয়া ৫০০ গ্রাম, টিএসপি ৪০০ গ্রাম, এমওপি ১৫০-২০০ গ্রাম। চার-ছয় বছর বয়সী গাছের জন্য গাছপ্রতি জৈবসার ২০-৩০ কেজি, ইউরিয়া ৬০০ গ্রাম, টিএসপি ৫০০ গ্রাম, এমওপি ২৫০-৩০০ গ্রাম। ৭-১০ বছর বয়সী গাছের জন্য গাছপ্রতি জৈবসার ৩০-৪৫ কেজি, ইউরিয়া ৭৫০ গ্রাম, টিএসপি ৭০০ গ্রাম, এমওপি ৫০০ গ্রাম। ১০ বছরের বেশি বয়সী গাছের জন্য গাছপ্রতি জৈবসার ৫০-৬০ কেজি, ইউরিয়া ১০০০ গ্রাম, টিএসপি ৭৫০ গ্রাম, এমওপি ৬০০ গ্রাম।

সেচ

আবহাওয়া ও মাটির ধরন অনুসারে শীতকালে ১০-১২ দিন ও গ্রীষ্মকালে ৭-১০ দিন অন্তর সেচ দিতে হয়। তবে সারা বছর ১২৫ সেন্টিমিটারের বেশি সুষমভাবে বৃষ্টিপাত হলে সেচ না দিলেও চলে। ফল ধরার পর নিয়মিত পানি সেচ দিলে ফলন বেড়ে যায়। ফল না ধরা পর্যন্ত লিচু বাগানে খরিপ ঋতুতে শসা, কুমড়া, ঝিঙ্গা, উচ্ছে বা করলা, মাষকলাই, গো মটর প্রভৃতি এবং রবি ঋতুতে বিভিন্ন ধরনের শীতকালীন সবজি চাষ করা যায়। ফলসা, আনারস, কলা, পেঁপে প্রভৃতি ফলও আন্ত শস্য হিসেবে চাষ করা যায়।

পরিচর্যা : সঠিক সময়ে পরিচর্যা করলে লিচু গাছের যেমন- সুষম বৃদ্ধি হয়, তেমনি ফলনও বেশি পাওয়া যায়। লিচুগাছের পরিচর্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো আগাছা দমন, পানি সেচ, ডাল ছাঁটাই, সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ, রোগ-পোকা ও বাদুড় দমন ইত্যাদি।

আগাছা দমন : ভালো ফলনের জন্য লিচু বাগানে অন্তত বছরে দুইবার অগভীর চাষ দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে।

ডালপালা ছাঁটাই : পূর্ণবয়স্ক গাছে পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশের জন্য অপ্রয়োজনীয় ডালপালা কেটে ফেলতে হবে। গাছের শুকনো ও রোগাক্রান্ত শাখা এবং পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত ডালও ছেঁটে দিতে হবে। পুরনো শাখা ছেঁটে দিলে গাছে নতুন শাখা বের হয়, নতুন শাখায় ফুল আসে। তবে লিচুর ডাল ছাঁটাইয়ের বেশি প্রয়োজন হয় না। কারণ গাছ থেকে ফল সংগ্রহের সময় যেসব ছোট ছোট ডাল ভাঙা হয় তাতেই অনেকটা ডাল ছাঁটাইয়ের কাজ হয়ে যায়।

পোকামাকড় : লিচুর পোকামাকড়ের মধ্যে ফল ছিদ্রকারী পোকা ও লিচুর মাকড়ই বেশি ক্ষতি করে থাকে।

ফল ছিদ্রকারী পোকা : ফল পরিপক্ক হওয়ার সময় এ পোকা ফলের বোঁটার কাছ দিয়ে ভিতরে ঢুকে বীজ খেতে থাকে। এরা ফলের শাঁস খায় না তবে বোঁটার কাছে বাদামি রঙের একধরনের করাতের গুঁড়ার মতো পদার্থ উৎপন্ন করে। এতে ফলের বাজারমূল্য কমে যায়। এ পোকা দমনের জন্য অনুমোদিত কীটনাশক সঠিক নিয়মে স্প্রে করতে হবে। তবে ফল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে স্প্রে করার কাজ শেষ করতে হবে।

লিচুর মাকড় : মাকড় লিচু গাছের পাতা, ফুল ও ফল আক্রমণ করে। আক্রান্ত পাতা কুঁকড়ে যায় এবং পাতার নিচের দিক লাল মখমলের মতো হয়। পরে পাতা দুর্বল হয়ে মরে যায় এবং ডালে ফুল, ফল ও নতুন পাতা হয় না।

দমনব্যবস্থা : ফল সংগ্রহের পর আক্রান্ত অংশ ভেঙে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এ পোকা দমনের জন্য অনুমোদিত কীটনাশক সঠিক নিয়মে স্প্রে করতে হবে। তবে ফল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে স্প্রে করার কাজ শেষ করতে হবে।

রোগবালাই : লিচুর বেশ কয়েকটি রোগের মধ্যে পাউডার মিলডিউ এবং অ্যানথ্রাকনোজ বা ফল পচা রোগই প্রধান। লিচুর মুকুলে সাদা বা ধূসর বর্ণের পাউডারের আবরণ দেখা যায়। আক্রান্ত মুকুল নষ্ট হয় এবং ঝরে পড়ে। রোগ দমনের জন্য গাছে মুকুল আসার পর অনুমোদিত কীটনাশক সঠিক নিয়মে স্প্রে করতে হবে।

অ্যানথ্রাকনোজ বা ফল পচা রোগ : এ রোগের আক্রমণে প্রথমে ফলের বোঁটার দিকে পানি ভেজা পচা দাগের সৃষ্টি হয়, যা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেয়ে সব ফল পচিয়ে ফেলে এবং একসময় ফল শুকিয়ে ঝরে পড়ে। এ রোগ দমনের জন্য লিচু বাগান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। নিচের মরা পাতা, আক্রান্ত ফল ও আগাছা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ফল গাছে থাকা অবস্থায় নিয়মিত অনুমোদিত ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে।

ফল ঝরা : ফল ঝরা লিচুর একটি প্রধান সমস্যা। পরাগায়ন ও গর্ভধারণে ব্যর্থতা, পুষ্টির অভাব, হরমোনের ভারসাম্যহীনতা, মাটিতে রসের অভাব, বাতাসে কম আর্দ্রতা, ঝড়ো বাতাস, পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ এবং বেশি গরম ও শুষ্ক আবহাওয়ার জন্যও লিচু ঝরে যেতে পারে। গুটি বাঁধার সময় প্রতি লিটার পানির সঙ্গে ১ গ্রাম জিংক সালফেট মিশিয়ে গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। সে সঙ্গে সেচ ও রোগ-পোকা দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

ফেটে যাওয়া : দীর্ঘ খরার পর হঠাৎ বৃষ্টি, শুষ্ক ও গরম হাওয়া, রোগ-পোকার আক্রমণে ফল ফেটে যেতে পারে। মাটিতে বোরন বা ক্যালসিয়ামের অভাব দেখা দিলে এবং আগাম জাতে এ সমস্যা দেখা দিতে পারে।

প্রতিকার : মাটিতে জৈবসার ও সেচ দিতে হবে। বর্ষার শুরুতে ও শেষে গাছের গোড়ায় ক্যালসিয়ামজাতীয় সার যেমন- ডলোচুন গাছপ্রতি ১০০ গ্রাম করে ব্যবহার করতে হবে অথবা ফলের কচি অবস্থায় চক পাউডার ২ গ্রাম ও বোরিক এসিড প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। সেই সঙ্গে রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে।

বাদুড় দমন : বাদুড়ের আক্রমণের কারণেও লিচুর ফলন হ্রাস পেতে পারে। বাদুড় দমনের জন্য ফল পাকার সময় বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রচলিত ও সহজ উপায়গুলোর মধ্যে ঢোল-টিন পেটানো, বাঁশ ফোটানো, পটকা ফোটানো, বাগানের চারপাশে জাল পেতে রাখা, জাল দিয়ে ফল ঢেকে রাখা ইত্যাদি।

লিচু সংগ্রহ

ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে লিচু গাছে ফুল আসে ও মে-জুন মাসে পাকা ফল সংগ্রহ করা হয়। এ সময় ফলের খোসা লালচে রং ধারণ করে। কয়েকটি পাতাসহ গোছা ধরে লিচু সংগ্রহ করা হয়। এতে ফল বেশি দিন ধরে ঘরে রাখা যায়। তিন থেকে ছয় বছর পর ফল ধরে। তবে ২০-৩০ বছর বয়স পর্যন্ত লিচু গাছে ফলন বাড়তে থাকে। প্রতিটি গাছ থেকে বছরে ৮০-১৫০ কেজি বা ৩২০০-৬০০০টি লিচু পাওয়া যায়।

স্ট্রবেরি

স্ট্রবেরি ফ্র্যাগারিয়া (Fragaria) জাতীয় উদ্ভিদ এবং সারা বিশ্বে এটি ফল হিসেবে চাষ করা হয়। গন্ধ, বর্ণ ও স্বাদে আকর্ষণীয় এই ফল, ফলের রস, জ্যাম, আইসক্রিম, মিল্কশেক এবং আরও অনেক খাদ্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণত শীতপ্রধান দেশের ফল। প্রতিবছর সারা পৃথিবীতে প্রায় ২,০০,০০০ হেক্টর জমিতে এর চাষ হয় এবং প্রায় ৩০ লক্ষ টন স্ট্রবেরি উৎপাদিত হয়। স্বল্প খরচে এর চাষ করা সম্ভব হলেও এটি বেশ উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয় বিধায় এর চাষ খুবই লাভজনক। গুল্মজাতীয় এ ফল গাছটি খুব ছোট বিধায় টবে বাড়ির ছাদ বা বারান্দায় স্ট্রবেরি উৎপাদন সম্ভব হয় ।

চিত্র : স্ট্রবেরি

বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভাবে স্ট্রবেরির চাষ শুরু হয়েছে। টিস্যুকালচার পদ্ধতির সোমাক্লোনালভেরিয়েশন প্রযুক্তির মাধ্যমে তিনটি জাত, রাবি-১, রাবি-২ ও রাবি-৩ তৈরি হয়েছে। এছাড়া বারি স্ট্রবেরি-১ উদ্ভাবিত হয়েছে। বাংলাদেশে এর ফলন বিঘাপ্রতি (৩৩শতাংশ) ১৫০০ কেজি। প্রতি বিঘায় ৫০০০টি গাছ রোপণ করতে হয়। কেজি প্রতি ৩০০ টাকা দরে বিক্রয় করলে বিঘাপ্রতি প্রায় ৪ লক্ষ টাকা নিট লাভ করা যায়।

পুষ্টি উপাদান	পরিমান	পুষ্টি উপাদান	পরিমান
পানি	৯১.৬৭গ্রাম	লৌহ	০.৩৮মি.গ্রা.
খাদ্যশক্তি	৩০কি.ক্যালরি	ম্যাগনেসিয়াম	৯.৭২মি.গ্রা.
আমিষ	০.৬১গ্রাম	ফসফরাস	১৮.৭৫মি.গ্রা.
চর্বি	০.৩৭গ্রাম	পটাশিয়াম	১৬৭.০০মি.গ্রা.
শর্করা	৭.০১গ্রাম	ভিটামিন সি	৫৭.০০মি.গ্রা.
অশোধিত আঁশ	২.২৯গ্রাম	নিয়াসিন	০.২৩মি.গ্রা.
ক্যালসিয়াম	১৩.৮৯মি.গ্রা.	ভিটামিনএ	২৭.০০আ.এ.
সূত্র: ইউএসডিএ নিউট্রিয়েন্ট ডটা বেজ			

চাষযোগ্য জাতসমূহ

জাত: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক অবমুক্তায়িত জাত বারি স্ট্রবেরি-১, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রচলিত জাতসমূহ রাবি-১, রাবি-২ এবং রাবি-৩ এবং মর্ডান হর্টিকালচার সেন্টার, নাটোর কর্তৃক প্রচলিত জাতসমূহ মর্ডান স্ট্রবেরি-১, মর্ডান স্ট্রবেরি-২, মর্ডান স্ট্রবেরি-৩, মর্ডান স্ট্রবেরি-৪ (Camarosa), মর্ডান স্ট্রবেরি-৫ আমাদের দেশে চাষযোগ্য জাত।

বারি স্ট্রবেরি-১ এর বৈশিষ্ট্য

বারি স্ট্রবেরি-১ বাংলাদেশের সর্বত্র চাষোপযোগী অবমুক্তায়িত একটি উচ্চফলনশীল জাত। গাছের গড় উচ্চতা ৩০ সে.মি. এবং বিস্তার ৪৫-৫০ সে.মি.। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে রোপণ করা হলে নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে গাছে ফুল আসতে শুরু করে এবং ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত ফল আহরণ করা যায়। গাছপ্রতি গড়ে ৩২টি ফল হয়, যার মোট গড় ওজন ৪৫০ গ্রাম। হেক্টরপ্রতি ফলন ১০-১২ টন। হৃৎপিণ্ডাকৃতির ফল ক্ষুদ্র থেকে মধ্যম আকারের, যার গড় ওজন (১৪ গ্রাম)। পাকা ফল আকর্ষণীয় টকটকে লাল বর্ণের। ফলের ত্বক

নরম ও ঈষৎ খসখসে। ফলের শতভাগ ভক্ষণযোগ্য। স্ট্রবেরির বৈশিষ্ট্য পূর্ণ সুগন্ধযুক্ত ফলের স্বাদ টক-মিষ্টি (টিএসএস ১২%)। জাতটি পর্যাপ্ত সরলতা (Runner) ও চারা উৎপাদন করে বিধায় এর বংশবিস্তার সহজ।

মাটি ও আবহাওয়া

স্ট্রবেরি মূলত মৃদু শীতপ্রধান অঞ্চলের ফসল। গ্রীষ্মায়িত জাত কিছুটা উচ্চ তাপসহিষ্ণু। দিন ও রাতে যথাক্রমে ২০-২৬ ডিগ্রি সে. ও ১২-১৬ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রা গ্রীষ্মায়িত জাতসমূহের জন্য প্রয়োজন। ফুল ও ফল আসার সময় শুষ্ক আবহাওয়া আবশ্যক। দেশের আবহাওয়ায় রবি মৌসুম স্ট্রবেরি চাষের উপযোগী। বৃষ্টির পানি জমে না এধরনের সুনিষ্কাশিত উর্বর দো-আঁশ থেকে বেলে-দোআঁশ মাটি স্ট্রবেরি চাষের জন্য উত্তম।

চারা উৎপাদন

স্ট্রবেরি রানারের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে থাকে। তাই পূর্ববর্তী বছরের গাছ নষ্ট না করে জমি থেকে তুলে জৈব পদার্থসমৃদ্ধ হালকা ছায়াযুক্ত স্থানে রোপণ করতে হবে। উক্ত গাছ হতে উৎপন্ন রানারের পর্ব সন্ধির নিচ থেকে যখন মূল বের হবে, তখন রানারটি মাতৃগাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভালোভাবে মিশানো গোবর মাটি (১:১) দিয়ে ভরা পলিথিন ব্যাগে (৪" x ৩") লাগাতে হবে এবং তা হালকা ছায়াযুক্ত নার্সারিতে সংরক্ষণ করতে হবে। অতিরিক্ত বৃষ্টি হতে রক্ষার জন্য বর্ষা মৌসুমে চারার উপর পলিথিনের ছাউনি দিতে হবে। রানারের মাধ্যমে বংশবিস্তার করা হলে স্ট্রবেরির ফলন ক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। তাই ফলন ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তিন বছর পরপর টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত চারার রানার থেকে বংশবিস্তার করা উত্তম।

জমি তৈরি ও চারা রোপণ

স্ট্রবেরি উৎপাদনের জন্য কয়েকবার চাষ ও মই দিয়ে এবং আগাছা, বিশেষ করে বহুবর্ষজীবী আগাছা অপসারণ করে উত্তমরূপে জমি তৈরি করতে হবে। চারা রোপণের জন্য বেড পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এজন্য ১ মিটার প্রশস্ত এবং ১৫-২০ সে.মি. উঁচু বেড তৈরি করতে হবে। দুইটি বেডের মাঝে ৫০ সে.মি. নালা রাখতে হবে। প্রতি বেডে ৫০ সে.মি. দূরত্বে দুই সারিতে ৫০ সে.মি. দূরে দূরে চারা রোপণ করতে হবে। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় ভাদ্রের মাঝামাঝি থেকে আশ্বিন মাস (সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য অক্টোবর) স্ট্রবেরির চারা রোপণের উপযুক্ত সময়।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

গুণগত মানসম্পন্ন উচ্চ ফলন পেতে হলে স্ট্রবেরির জমিতে নিয়মিত পরিমিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে। ছকে বিভিন্ন সারের হেক্টরপ্রতি পরিমাণ দেখানো হলো:

সারের নাম	পরিমাণ	সারের নাম	পরিমাণ
পচা গোবর	৩০টন/হে.	এমওপি	২২০কেজি/হে.
ইউরিয়া	২৫০কেজি/হে.	জিপসাম	১৫০কেজি/হে.
টিএসপি	২০০কেজি/হে.	জিংক সালফেট	২.৫কেজি/হে.

শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট ও অর্ধেক পরিমাণ এমওপি সার জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া ও অবশিষ্ট এমওপি সার চারা রোপণের ১৫ দিন পর থেকে ১৫-২০ দিন পরপর ৪-৫ কিস্তি উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

পানি সেচ ও নিষ্কাশন: স্ট্রবেরি চাষে প্রচুর পানির প্রয়োজন হয়। জমিতে রসের অভাব দেখা দিলে পর্যাপ্ত পানি সেচ দিতে হবে। স্ট্রবেরি জলাবদ্ধতা মোটেই সহ্য করতে পারে না। তাই বৃষ্টি বা সেচের অতিরিক্ত পানি দ্রুত তা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

সরাসরি মাটির সংস্পর্শে এলে স্ট্রবেরির ফল পচে নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর স্ট্রবেরির বেড খড় বা কালো পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। খড়ে যাতে উইপোকার আক্রমণ না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। জমি সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। গাছের গোড়া হতে নিয়মিতভাবে রানার বের হয়, যা ফল উৎপাদনের অন্তরায়। এজন্য উক্ত রানারসমূহ নিয়মিত কেটে ফেলতে হবে। রানার কেটে না ফেললে গাছের ফুল ও ফল উৎপাদন বিলম্বিত হয় এবং হ্রাস পায়।

রোগবালাই ও প্রতিকার

পাতায় দাগপড়া রোগঃ কোনো কোনো সময়, বিশেষত কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় পাতায় বাদামি রং-এর দাগ পরিলক্ষিত হয়। এ রোগের আক্রমণ হলে ফলন এবং ফলের গুণগত মান হ্রাস পায়।

ফল পচা রোগঃ এ রোগের আক্রমণে ফলের গায়ে জলে ভেজা বাদামি বা কালো দাগের সৃষ্টি হয়। দাগ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং ফল খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে যায়।

ভারটিসিলিয়ামউইল্টঃ এ রোগে আক্রান্ত গাছ হঠাৎ করে দুর্বল ও বিবর্ণ হয়ে পড়ে। আক্রমণ বেশি হলে গাছ বাদামি বর্ণ ধারণ করে এবং মারা যায়। সাধারণত জলাবদ্ধ জমিতে এ রোগের আক্রমণ বেশি হয়।

প্রতিকার

জমি শুষ্ক রাখতে হবে। পলিথিন ব্যবহার করলে তা তুলে ফেলতে হবে। অনুমোদিত কীটনাশক/ছত্রাকনাশক নির্দিষ্ট মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।

পাখি

বিশেষ করে বুলবুলি ও শালিক স্ট্রবেরি ফলের সবচেয়ে বড় শত্রু। ফল আসার পর সম্পূর্ণ পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই পাখির উপদ্রব শুরু হয়।

প্রতিকার

ফুল আসার পর সম্পূর্ণ বেড জাল দ্বারা ঢেকে দিতে হবে যাতে পাখি ফল খেতে না পারে।

মাতৃগাছ রক্ষণাবেক্ষণ

স্ট্রবেরির গাছ প্রখর সৌরতাপ এবং ভারী বর্ষণ সহ্য করতে পারে না। এ জন্য মার্চ-এপ্রিল মাসে হালকা ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে। নতুবা ফল আহরণের পর মাতৃগাছ তুলে টবে রোপণ করে ছায়ায় রাখতে হবে। ফল আহরণ শেষ হওয়ার পর সুস্থ-সবল গাছ তুলে পলিথিন ছাউনির নিচে রোপণ করলে মাতৃগাছকে খরতাপ ও ভারী বর্ষণের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা যাবে। মাতৃগাছ থেকে উৎপাদিত রানার পরবর্তী সময়ে চারা হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি সময়ে (সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে) রোপণকৃত বারি স্ট্রবেরি-১ এর ফল সংগ্রহ পৌষ মাসে আরম্ভ হয়ে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত (ডিসেম্বর থেকে মার্চ) চলে। ফল পেকে লাল বর্ণ ধারণ করলে ফল সংগ্রহ করতে হয়। স্ট্রবেরির সংরক্ষণকাল খুবই কম বিধায় ফল সংগ্রহের পরপর তা টিস্যু পেপার দিয়ে মুড়িয়ে প্লাস্টিকের ঝুড়ি বা ডিমের ট্রেতে এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে ফল গাদাগাদি অবস্থায় না থাকে। ফল সংগ্রহের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাজারজাত করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়
মাটির স্বাস্থ্য

মাটির স্বাস্থ্য কথাটি শুনে তোমরা কি খুব অবাক হয়েছ ? মাটির আবার স্বাস্থ্য কী ? আমরা মানুষের স্বাস্থ্য বিষয়ে জানি। আমাদের গৃহপালিত জীবজন্তু যেমন- গরু, ছাগল, মহিষ, হাঁস, মুরগি এমনকি কুকুর-বিড়ালের স্বাস্থ্য সম্পর্কেও জানি। মানুষ বা প্রাণী অর্থাৎ জীবনের সাথেই স্বাস্থ্য জড়িত। তাহলে প্রশ্ন আসে মাটির কি জীবন আছে? হ্যাঁ, মাটির জীবন আছে। বিজ্ঞানীরা মাটির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মাটিকে জীবিত বস্তু হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ অর্থে মাটির জীবন নেই। তবে মাটিতে অসংখ্য জীব রয়েছে। এর মধ্যে কিছু আমরা খালি চোখে দেখতে পাই, যেমন- কেঁচো। আবার অধিকাংশই খালি চোখে দেখতে পাই না। এগুলো অণুজীব। এক গ্রাম মাটিতে হাজারের অধিক প্রজাতির কোটি কোটি অণুজীব থাকে। মাটিতে অবস্থিত জীব ও অণুজীব গাছ বা ফসলের পুষ্টি উপাদান সহজলভ্য করার কাজে অংশগ্রহণ করে।

মাটি কী

তোমরা জানো মাটি কী? মাটি হলো ভূপৃষ্ঠের ভঙ্গুর বা অস্থিতিশীল অগভীর আবরণ যা স্থানভেদে ১ মিটারের চেয়েও কম গভীর। কিন্তু যেখানে জগতের অধিকাংশ জীবের অবস্থান এবং যাকে কেন্দ্র করেই জীবনের অস্তিত্ব। আমরা কিসের উপর চলাফেরা করি? অবশ্যই মাটির উপর। কোথায় ঘরবাড়ি তৈরি করি? মাটির উপর। আমাদের খাবার কোথা থেকে পাই? মাটি থেকে। আমাদের খাবারের ৯৫ ভাগ সরাসরি বা পরোক্ষভাবে মাটি থেকে আসে। ধান, চাল, শাকসবজি, ফলমূল সরাসরি মাটি থেকে উৎপাদিত হয়। জীবজন্তু যেমন- গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ ইত্যাদি তৃণভোজী প্রাণী মাটি থেকেই খাবার গ্রহণ করে। হাঁস, মুরগিও মাটি থেকে সরাসরি বা তৈরি করা পশু-খাদ্যও মাটি থেকে আসে। মাছের খাবারও আসে মাটিতে উৎপাদিত প্ল্যাংক্টন বা তৈরি করা মাছের খাদ্য থেকে। তার মানে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ সবই মাটি থেকে আসে।

খাদ্য ও পুষ্টি

স্বাস্থ্যের জন্য আমাদের যেমন- প্রয়োজন শর্করা, আমিষ ও চর্বি বা তেলজাতীয় খাবার, তেমনি প্রয়োজন ভিটামিন ও খনিজ লবণ বা মিনারেল। শর্করা, আমিষ ও চর্বি বা তেলজাতীয় খাবার প্রয়োজন হয় অধিক হারে আর ভিটামিন ও খনিজ লবণ বা মিনারেলের প্রয়োজন অতি স্বল্প মাত্রায়। কিন্তু এসবের অভাবে শরীর সুস্থ থাকে না। আর এর সবই পাই উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে খাবারের মাধ্যমে। মাটিতে যদি ক্যালসিয়াম কম থাকে, তবে উদ্ভিদেও ক্যালসিয়াম কম থাকবে। আমাদের শরীরে ক্যালসিয়ামের অভাব হলে বুকে ধুকধুক, অনিদ্রা, অস্বস্তিভাব, পেশিতে টান, স্নায়ুদুর্বলতা, অবসাদ ও হাড়ের ক্ষয় দেখা দেয়। মাটিতে মিনারেলের অভাব থাকলে ফসলেও মিনারেলের অভাব ঘটবে, ফলে আমাদের স্বাস্থ্যে বিরূপ প্রভাব দেখা দিবে। এ জন্যই আমাদের মাটির স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে হবে। মাটিতে আয়োডিনের অভাব থাকলে উদ্ভিদে আয়োডিনের অভাব দেখা দেয়। আয়োডিনের অভাবে গলা ফুলা বা গলগন্ড রোগ দেখা দেয়। বুদ্ধির বিকাশও কম হয়।

আমাদের দেশের উত্তরবঙ্গে এ রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। কিন্তু খাবার লবণে আয়োডিন মিশ্রণের কারণে বর্তমানে এ রোগের প্রাদুর্ভাব কমেছে।

জীববৈচিত্র্য

মাটি আমাদের খাদ্য, তন্তু বা সুতা তথা বস্ত্র, জ্বালানি ও ওষুধের উৎস। মাটি পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করে। মাটি জৈব কার্বন ধারণ করে জলবায়ুর বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে আমাদের রক্ষা করে। মাটিতে পানি ধারণ ও চুইয়ে নিচে যাওয়ার ফলে একদিকে আমরা খরা ও বন্যা থেকে রক্ষা পাই। সুস্থ মাটি হলো আমাদের জীবনের ভিত্তি। এবার প্রশ্ন হলো মাটির স্বাস্থ্য বলতে কী বোঝায়? মাটিতে অবস্থিত জীবের টেকসই উৎপাদিকাশক্তি, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার পাশাপাশি টেকসইভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাস্থ্য বজায় রাখার ক্ষমতাকে মাটির স্বাস্থ্য বলে।

মাটির গুণাগুণ

সুস্থ মাটির কী কী গুণাগুণ থাকতে হবে? মাটির অম্লতা ৫.৬ থেকে ৭.৩ এর মধ্যে থাকবে। মাটি হতে হবে অলবণাক্ত, জৈব পদার্থ ৩ থেকে ৫ শতাংশের মধ্যে থাকবে। মাটির ধনাত্মক আধান বিনিময় ক্ষমতা ১৫ মিলি তুলাংকের বেশি হতে হবে, মাটির উর্বরতা মান হবে উত্তম, মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা হবে বেশি। মাটির বুনট ও সংগঠন এমন হবে যাতে গাছের শিকড় সহজে মাটিতে প্রবেশ করতে পারে। মাটিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক কেঁচো এবং অণুজীব থাকবে। মাটি হবে দূষণমুক্ত। কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ বা ক্ষতিকর ভারী পদার্থ মাটিতে থাকতে পারবে না। মাটিতে ক্ষতিকর ভারী পদার্থ থাকলে শিকড়ের মাধ্যমে উদ্ভিদ তা গ্রহণ করবে এবং খাবারের মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করবে।

সুস্থতা রক্ষায় করণীয়

সুস্থ মাটি পেতে হলে আমাদের কী করতে হবে? মাটির অম্লতা বেশি হলে চুন বা ডলো চুন প্রয়োগ করে মাটির অম্লতা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব। মাটিতে জৈব পদার্থ প্রয়োগ করতে হবে। ফসল আহরণের সময় গাছের গোড়া থেকে যথাসম্ভব উপরে ফসল কর্তন করতে হবে। দৈনন্দিন খাবারের অবশিষ্টাংশ, শাকসবজির অবশিষ্টাংশ মাটিতে পুঁতে রেখে জৈব সার প্রস্তুত করে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। গোবর সার ও হাঁস, মুরগির বিষ্ঠা পচিয়ে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। মাটি পরীক্ষা করে ফসলের চাহিদানুযায়ী সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে অবস্থানভেদে জমির উর্বরতায় পার্থক্য রয়েছে এবং বিভিন্ন ফসলের পুষ্টি চাহিদাও ভিন্ন। উদহারণ হিসেবে বলা যায় ব্রি ধান-২৮ এর চেয়ে ব্রি ধান-২৯ এর পুষ্টি চাহিদা বেশি।

আন্তর্জাতিক মৃত্তিকা দিবস

আমাদের জীবনে মাটির স্বাস্থ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাতিসংঘ প্রতিবছর ০৫ ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক মৃত্তিকা দিবস হিসেবে উদযাপনের ঘোষণা দিয়েছে। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সকল দেশেই এ দিনটি পালিত হচ্ছে। এছাড়া জতিসংঘ ২০১৫ সালকে আন্তর্জাতিক মৃত্তিকা বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশ এটিকে যথাযথ মর্যাদায় পালন করেছে।

মাটির স্বাস্থ্য রক্ষার সুফল

মাটির স্বাস্থ্য ভালো থাকলে ফসলের উৎপাদন বাড়বে। উৎপাদিত ফসলের মানও ভালো হবে। উৎপাদন খরচ কমবে এবং খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে। আমাদের স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে। বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে প্রতিবছর প্রায় ৬৯ হাজার হেক্টর হারে কৃষিজমি কমছে অন্যদিকে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ যোগ হচ্ছে। প্রতিবছরই প্রায় ৭ লক্ষ মেট্রিক টন করে জ্যামিতিক হারে খাদ্যের চাহিদা বাড়ছে। সেখানে মাটির স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখা একান্তই কর্তব্য।

পঞ্চম অধ্যায়
কৃষি উপকরণ

বীজ

গাছের যে অংশ বা অঙ্গ বংশবিস্তারের জন্য তথা নতুন আরেকটি গাছ জন্মানোর কাজে ব্যবহার করা হয় তাই বীজ। যেমন- ধান গাছের ধান, আখ গাছের কাণ্ড, পাথরকুচির পাতা ইত্যাদি বীজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এমনিভাবে কোনো গাছের ফল, কোনো গাছের কাণ্ড, কোনো গাছের পাতা বা কোনো গাছের মূল বীজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বীজকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়। কৃষিকাজে ব্যবহৃত বীজ সাধারণভাবে নিম্নোক্ত দুইভাবে ভাগ করা যায়-

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজঃ (Botanical Seed)**:** নিষিক্ত ও পরিপক্ক ডিম্বককে উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজ বলে; অর্থাৎ ফুলের স্ত্রী অঙ্গ ও পুরুষ অঙ্গের মিলনের ফলে এ বীজ উৎপাদিত হয়। যেমন- তৈল বীজ (সরিষা, তিল, তিসি), ডাল বীজ (মসুর, মুগ, মাষকালাই, খেসারি, ফেলন), দানা শস্য বীজ (ধান, গম, ভুট্টা, চিনা, কাউন, বার্লি) ইত্যাদি।

কৃষি বীজঃ (Agricultural Seed)**:** উদ্ভিদ বা গাছের যে কোনো অংশ বা অঙ্গ যেমন- ফল, বীজ, কাণ্ড, পাতা, শিকড় ইত্যাদি যা উপযুক্ত স্থানে অনুকুল আবহাওয়ায় বা পরিবেশে নতুন গাছের জন্ম দিতে সক্ষম তাই কৃষি বীজ। যেমন- ধান, গম, ভুট্টা, সরিষা, মুসুর, মুগ কাণ্ড (আখ, গোলআলু), পাতা (পাথরকুচি), শিকড় (মিষ্টি আলু, কাকরোল) ইত্যাদি।

ভালো বীজের বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ

ফসল উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত কৃষি উপকরণগুলো হলো- বীজ, সার, সেচ, বালাইনাশক ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে একমাত্র বীজই জীবন্ত উপকরণ এবং বীজই কৃষি উৎপাদনের চাবিকাঠি। বীজ ভালো না হলে অন্য সকল উপকরণ পরিমিতভাবে প্রদান করা হলেও কাঙ্ক্ষিত ফলন পাওয়া যাবে না। আমরা সাধারণভাবে উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজকে বীজ হিসেবে বুঝে থাকি। ভালো ফলন পেতে হলে অবশ্যই ভালো বীজ চিনতে হবে এবং কৃষি উৎপাদনে ভালো বীজ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। ভালো বীজের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপঃ

(১) জাতের বিশুদ্ধতাঃ বীজের জাত বিশুদ্ধতা বলতে বংশগত বিশুদ্ধতা (Genetical Purity) বোঝায়। অর্থাৎ বীজের এক জাতের সাথে অন্য জাতের মিশ্রণ থাকবে না। বীজের প্রত্যেক জাতের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে যা কেবল মাঠ পর্যায়ে ফসলের বিভিন্ন বৃদ্ধি পর্যায়ে পরিলক্ষিত হয়। মাঠ পর্যায়েই বীজের জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপদ দূরত্ব, রগিং ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়। বীজ পরীক্ষাগারে বীজের জাত বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করা যায় না।

(২) বীজ বিশুদ্ধতা: বীজ বিশুদ্ধতা বলতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ধুলাবালিবিহীন, আগাছা বা অন্য ফসলের বীজমুক্ত এবং জড় পদার্থমুক্ত বীজকে বোঝায়। সব ফসলের বীজের বিশুদ্ধতার শতকরা হার সমান নয়। জাতীয় বীজ বোর্ড (NSB) এর বীজ মান অনুযায়ী বীজের প্রত্যায়িত শ্রেণির ধান, গম, পাট, বাদাম, মসুর, মাষকলাই বীজের বিশুদ্ধতা কমপক্ষে ৯৬%, সরিষা, ছোলা, মুগ বীজের ৯৭% থাকতে হবে।

(৩) অঙ্কুরোদগম (গজানো) ক্ষমতা: বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বলতে অনুকূল পরিবেশে ১০০টি বপন করলে কতটি সুস্থ চারা জন্মায় তাকে বোঝায়। ভালো বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা অধিক হতে হবে। অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বেশি হলে মাঠে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চারা পাওয়া যাবে। ফসলের প্রকার ভেদে প্রত্যায়িত বীজের অনুমোদিত অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা সাধারণত ৬০ - ৮০%। জাতীয় বীজ বোর্ড (NSB) এর বীজমান অনুযায়ী ধান, গম বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা সর্বনিম্ন ৮০%, গাজর, লালশাক, ডাঁটাশাক বীজের সর্বনিম্ন অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ৬০%।

(৪) বীজের আর্দ্রতা: বীজের মধ্যে শতকরা যে পরিমাণ পানি থাকে তাই বীজের আর্দ্রতা। বীজের আর্দ্রতা ওজনভিত্তিক শতকরা হারে প্রকাশ করা হয়। বীজের আর্দ্রতা যত বেশি হবে বীজের গজানো ক্ষমতা ও তেজ তত দ্রুত কমে যায়। বিভিন্ন বীজের অনুমোদিত আর্দ্রতা বিভিন্ন রকমের, সাধারণত প্রত্যায়িত বীজের সর্বোচ্চ অনুমোদিত আর্দ্রতা ৬-১২%। জাতীয় বীজ বোর্ড (NSB) এর বীজমান অনুযায়ী ধান ও গম বীজের সর্বোচ্চ আর্দ্রতা ১২%, বাঁধাকপি বীজের সর্বোচ্চ আর্দ্রতা ৭%, শালগম বীজের সর্বোচ্চ আর্দ্রতা ৬%।

(৫) উজ্জ্বল রং: বীজের রং জাতের বৈশিষ্ট্যানুসারে স্বাভাবিক উজ্জ্বল থাকতে হবে। বীজ ফ্যাকাসে কিংবা ময়লাযুক্ত হতে পারবে না।

(৬) রোগ ও পোকামাকড়মুক্ত: ভালো বীজ রোগ ও পোকামাকড়মুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ বীজ পোকা কাটা হতে পারবে না, রোগাক্রান্ত হতে পারবে না। এক কথায় বীজ সুস্থ হতে হবে। বীজ পোকাক্রান্ত বা রোগাক্রান্ত হলে উক্ত বীজ থেকে চারা গজানোর নিশ্চয়তা থাকে না।

(৭) বীজের আকার: সব বীজের আকার সমান হয় না। সাধারণত বড় আকারের বীজ থেকে সুস্থ সবল চারা এবং ভালো ফসল পাওয়া যায়। একই আকারের বীজ থেকে মাঠে একই আকার ও আকৃতির (সাইজের) চারা পাওয়া যায়। বীজ একই আকারের হলে যান্ত্রিকভাবে বীজ বপন সহজ হয়।

(৮) বীজের তেজ: যে বীজের তেজ (Vigour) যত বেশি উক্ত বীজ মাঠের প্রতিকূল পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে সুস্থ চারা দিতে সক্ষম হয়। যে বীজের তেজ যত কম উক্ত বীজ তত তাড়াতাড়ি গজানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। বীজের তেজ চারা বৃদ্ধির দ্রুততা প্রকাশ পায়। নির্দিষ্ট সময়ে চারার দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে বীজের তেজ নির্ণয় করা যায়।

১১। বীজের সুপ্ততা: উপযুক্ত পরিবেশে কোনো জীবিত/সজীব বীজের অঙ্কুরোদগম না হওয়াকেই বীজের সুপ্ততা বলে। বীজ উৎপাদনের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সকল বীজেরই সুপ্ততা থাকা আবশ্যক। কিছু ফসলের বীজ পরিপক্ক হওয়ার পরপরই সুপ্ততা ভেঙে যায় এবং কিছু ফসলের বীজের সুপ্ততা নির্দিষ্ট সময়ের পরে ভঙ্গ হয়। বীজের সুপ্ততা প্রয়োজনে বিভিন্ন উপায়ে ভঙ্গ করা যায়। বীজ ভেদে তাপ প্রয়োগ করে, ভিজিয়ে অথবা বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করে বীজের সুপ্ততা ভঙ্গ করা যায়।

ভালো বীজ যে কারণে গুরুত্বপূর্ণ

ক) ভালো বীজ গজায় তাড়াতাড়ি। খ) ভালো বীজের চারা বাড়ে তাড়াতাড়ি গ) জমিতে পরিমিত সংখ্যক চারা জন্মায় ঘ) শিষ বড় হয়, দানা বড় হয় অথবা ফল বড় হয় ঙ) ফলন বেশি হয় চ) ফসলের মান ভালো হয় ছ) কৃষি উৎপাদন ব্যয় কম হয়। জ) কৃষক লাভবান হয়।

বীজ ব্যবস্থাপনা

বীজ ফসল উৎপাদন থেকে শুরু করে পরবর্তী বপন মৌসুমে কৃষক পর্যায়ে পৌছে দেওয়া পর্যন্ত সকল কর্মকাণ্ডই বীজ ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত। বীজ ব্যবস্থাপনা প্রধানত: তিন ভাগে বিভক্ত:

ক) বীজ উৎপাদন খ) বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ গ) বীজ বিপণন

ক) বীজ উৎপাদন: ফসল উৎপাদন ও বীজ ফসল উৎপাদন এক নয়। বীজ উৎপাদন একটি সম্পূর্ণ কারিগরি প্রক্রিয়া। বীজ উৎপাদনের জন্য কিছু বিশেষ সতর্কতামূলক কর্মকাণ্ড অবশ্যই পালনীয় যা ফসল উৎপাদনের জন্য পালন না করলে ফসলের ফলনে কোনো প্রভাব পড়ে না। কিন্তু বীজ উৎপাদনে বিশেষ কারিগরি প্রক্রিয়াসমূহ পালন করা না হলে বীজের গুণগতমান অবশ্যই নিম্নমানের হবে। ফলে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি থেকে বীজের প্রত্যয়ন পাওয়া যাবে না। ফলে এ বীজ আর বীজ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

বীজ ফসল উৎপাদনের প্রক্রিয়া বা ধাপসমূহ নিম্নরূপ-

১) জমি নির্বাচন: বীজ ফসলের চাহিদা মোতাবেক সবচেয়ে উর্বর, বন্যামুক্ত, সেচ ব্যবস্থাযুক্ত, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভালো এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো এমন জমি বীজ ফসলের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

২) বীজতলা তৈরি: অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বীজতলায় চারা উৎপাদন ও মাঠে চারা রোপণ করে বীজ ফসল উৎপাদন করা হয়। চারা উৎপাদনের জন্য বীজতলাকে ভালোভাবে চাষ ও মই দিয়ে তৈরি করে নিতে হবে। এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হবে।

৩) বীজ বপন: বীজতলার আকার অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিমাণ বীজ বীজতলায় সমদূরত্বে বপন করতে হবে। প্রয়োজন হলে বীজ বপনের পর বীজতলা ঢেকে দিতে হবে।

৪) জমি তৈরি: বীজ ফসল উৎপাদনের জন্য জমিকে ভালোভাবে চাষ ও মই দিয়ে তৈরি করে নিতে হবে। জমি তৈরির সময় ফসলভিত্তিক অনুমোদিত পরিমাণ সার জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

৫) চারা রোপণ: ফসলভিত্তিক নির্দিষ্ট বয়সের চারা জমিতে নির্ধারিত দূরত্বে সারি করে লাগাতে হবে। চারা থেকে চারা এবং সারি সারির দূরত্ব যেন সমভাবে হয় তার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে। এতে ফসল পরিচর্যার কাজ সহজ হয়।

৬) ফসল পরিচর্যা: ফসল মাঠে থাকা অবস্থায় সুষ্ঠুভাবে বেড়ে উঠার জন্য যে সকল কাজ করা হয় তাই ফসল পরিচর্যার অন্তর্ভুক্ত। ফসল মাঠে থাকা অবস্থায় সাধারণত সেচ প্রয়োগ, সার প্রয়োগ, আগাছা দমন, রোগবালাই দমন ইত্যাদি কাজ করা হয়। তাছাড়া বিশেষ বিশেষ ফসলের জন্য গাছের সারিতে বা গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দেওয়া হয়।

৭) নিরাপদ দূরত্ব: বীজ ফসল উৎপাদনের জন্য অবশ্যই নিরাপদ দূরত্ব (Isolation Distance) বজায় রাখতে হবে। অর্থাৎ কোনো বীজ ফসল অন্য জাত থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বের পরেই কেবল উৎপাদন করা যাবে। ধান ও গম বীজের ৩ মিটার, আলু বীজের ক্ষেত্রে ১৫-৩০ মিটার এবং সরিষার ক্ষেত্রে ২০০-৫০০ মিটার নিরাপদ দূরত্ব (Isolation Distance) বজায় রাখা হয়।

৮) রগিং: বীজ ফসলের মাঠের মধ্যে এমন কোনো গাছ যা অন্য সকল গাছের চেয়ে আলাদা বা রোগাক্রান্ত পরিলক্ষিত হলে তা তুলে ফেলে দেয়াই হলো রগিং। সাধারণত গাছের বিভিন্ন বৃদ্ধি পর্যায়েই ভালো বীজ উৎপাদনের জন্য রগিং করা হয়।

৯) সঠিক সময়ে ফসল কর্তন: ভালো বীজের জন্য অবশ্যই সময়মতো বীজ ফসল কর্তন করতে হবে। সাধারণত ৮০% ফসল পরিপক্ক ও পুষ্ট হলেই দ্রুততার সাথে কর্তন করতে হবে। বীজ ফসল কর্তনের সাথে সাথেই মাড়াই করতে হবে। সে জন্য প্রতিদিন যতটুকু ফসল মাড়াই করা যাবে ঠিক ততটুকু ফসল কর্তন করা হয়।

১০) মাঠ পরিদর্শন: মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনের জন্য মাঠ পরিদর্শন অত্যাবশ্যক। সঠিক সময়ে সেচ, সার প্রয়োগ, বালাইনাশক প্রয়োগ, রগিং ও যথাসময়ে ফসল কর্তনের জন্য অবশ্যই গাছের বিভিন্ন বৃদ্ধি পর্যায়ে মাঠ পরিদর্শন করা বাঞ্ছনীয়।

খ) বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ: বীজ ফসল কর্তনের পর বীজের মান অক্ষুণ্ন রাখার জন্য মাড়াই অঙ্গনে এবং গুদামে নিম্নোক্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়।

১) মাড়াইকরণ: কর্তনকৃত বীজ ফসলের বীজকে গাছের অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় অংশ থেকে আলাদা করাই হলো মাড়াই। বীজ ফসল কর্তনের পরপরই দ্রুততার সাথে মাড়াই করতে হবে। খাবার ফসলের ন্যায় বীজ ফসল কর্তনের পর গাদা বা পালা করে রাখা উচিত নয়। গাদা বা পালা করে বীজ ফসলকে রাখা হলে গাদার তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে বীজের তেজ/জীবনীশক্তি দ্রুত কমে গিয়ে বীজ গজানো ক্ষমতা লোপ পাবে। বীজ ফসল গরু বা মহিষ দিয়ে মাড়াই করা যাবে না। এতে গরু বা মহিষের পায়ের চাপে বীজের ভ্রূণ নষ্ট হয়ে এর গজানো ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। সাধারণত বীজ ফসল হাত দিয়ে ড্রাম বা কাঠের তক্তার উপর বীজের আঁটি পিটিয়ে, প্যাডেল বা পাওয়ার থ্রেসারের অথবা কম্বাইন্ড হারভেস্টরের মাধ্যমে মাড়াই করতে হবে। বর্তমানে বীজ ফসল অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের মাড়াই যন্ত্র পাওয়া যায়।

২) প্রাথমিক পরিষ্কারকরণ: বীজ মাড়াই করার পর বীজের সাথে খড়কুটা, চিটা, অপুষ্ট দানা, অন্যান্য জড়পদার্থ মাটির দানা, পাথরকণা ইত্যাদি থেকে যায়। এই সকল অপ্রয়োজনীয় পদার্থকে বীজ থেকে অপসারণকেই পরিষ্কারকরণ বোঝায়। এগুলো বীজের সাথে থাকলে বীজ শুকানোতে সমস্যা হয় এবং রোগ-

পোকামাকড়ের আক্রমণ বেড়ে যাবে। এ সকল অপ্রয়োজনীয় পদার্থ হাত দ্বারা, কুলা দ্বারা এবং বর্তমানে শক্তিচালিত বিভিন্ন ক্লিনার মেশিন দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করা যায়। বীজ ফসল অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের প্রিক্লিনিং মেশিন বাজারে পাওয়া যায়।

৩) গ্রেডিংকরণ: এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বীজকে সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কারকরণ এবং বীজের আকার-আকৃতি অনুসারে বীজকে আলাদাকরণ করা হয়। সম বা একই আকারের (Uniform Size) বীজের বাজারমূল্য তুলনামূলক বেশি। তাছাড়া একই আকারের বীজ যন্ত্র দ্বারা সহজে মাঠে বপন করা যায়। সাধারণত ক্লিনার-কাম-গ্রেডার মেশিন দ্বারা বীজ গ্রেডিং করা হয়। বাজারে বিভিন্ন ধরনের ক্লিনার-কাম-গ্রেডার মেশিন পাওয়া যায়।

৪) শুকানো: বীজ মাড়াইয়ের পর বীজে পানির পরিমাণ বেশি থাকে। বীজ ফসল ভেদে বীজে পানির পরিমাণ বিভিন্ন হয়ে থকে। ধান বীজের ক্ষেত্রে কর্তনের পর পর বীজ মাড়াই করলে আবহাওয়া ভেদে বীজে ১৬-২৩% আর্দ্রতা থাকে। বীজের এ অতিরিক্ত আর্দ্রতা বা পানি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে না নিলে বীজের তেজ (Vigour) কমে যাবে বা বীজ মরে গিয়ে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। সুতরাং বীজ মাড়াইয়ের পর পরই বীজ রোদে বা মেশিনের সাহায্যে শুকানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। ফসলভিত্তিক বীজ শুকানোর আলাদা ধরনের ড্রাইং মেশিন রয়েছে।

৫) বীজের গুণগত মান পরীক্ষণ: বীজ শুকানোর পর বীজ গুদামে লট আকারে রাখার আগে বীজের মান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। বীজের আর্দ্রতা, বিশুদ্ধতা ও অঙ্কুরোদগমক্ষমতা পরীক্ষা করে বীজের মান নিশ্চিত হয়ে বীজ গুদামজাত করতে হবে।

৬) সংরক্ষণ: বীজের গুণগতমান সন্তোষকজনক হলেই কেবল বীজ গুদামে সংরক্ষণ করতে হবে। বীজ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের সংরক্ষণাগার ব্যবহার করা যায়। যেমন- সাধারণ গুদাম, ডিহিইমিডিফাইড গুদাম এবং কোল্ড স্টোরেজ। সাধারণত ধান, গম বীজের জন্য সাধারণ গুদাম, সবজি বীজের জন্য ডিহিইমিডিফাইড গুদাম এবং আলু বীজের জন্য কোল্ড স্টোরেজ ব্যবহার করা হয়। ধান, গম বীজও ডিহিইমিডিফাইড গুদামে সংরক্ষণ করা যায়। ডিহিইমিডিফাইড গুদাম ও কোল্ড স্টোরেজে বীজ সংরক্ষণ খরচ অনেক বেশি।

৭) বীজ লটকরণ: বীজ গুদামে বীজ একই গাদায় নির্দিষ্ট পরিমাণ বীজ বস্তায় ভর্তি করে লট আকারে সাজিয়ে রাখা হয়। বীজ ফসল অনুযায়ী বীজ লটের বীজের পরিমাণের ভিন্নতা রয়েছে। ধান ও গম বীজের ক্ষেত্রে বীজ লটের আকার হলো ৩০ মে. টন। প্রত্যেকটি বীজ লটকে নম্বর দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে। লটে কোন জাতের কী পরিমাণ বীজ রয়েছে, উৎপাদনকারী, উৎপাদন বর্ষ এবং বীজের গুণগত মান সম্পর্কিত তথ্যাদি সংবলিত লেবেলকার্ড লটে লগিয়ে দিতে হবে।

৮) পাক্ষিক পরীক্ষণ: বীজের মান অক্ষুণ্ন রাখার জন্য পাক্ষিকভাবে বীজের গুণগত মান বিশেষ করে বীজের আর্দ্রতা ও অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। বীজের আর্দ্রতা বেড়ে গেলে সাথে শুকানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। তা না হলে বীজের তেজ কমে গিয়ে দ্রুত অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা লোপ পাবে।

৯) পোকামাকড় দমন: প্রতিদিন কমপক্ষে একবার বীজ গুদামের প্রতিটি লট নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে কোনো লটে পোকা বা পাউডার জাতীয় কোনো কিছু আছে কিনা। দেখা গেলে প্রয়োজন অনুযায়ী স্প্রে বা ফিউমিগেশনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

১০) চূড়ান্ত পরীক্ষণ: বীজ বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে বীজ প্যাকেট করার পূর্বে অবশ্যই গুণগত মান চূড়ান্তভাবে নিজের পরীক্ষাগারে এবং নিয়মানুসারে সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষা করে নিতে হবে। পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক হলেই কেবল বীজ প্যাকেটজাত করতে হবে।

১১) বীজ প্যাকেটকরণ: বীজ প্যাকেট করার পূর্বে গুণগত মান নিশ্চিত হয়ে বীজ প্যাকেট করতে হবে। বীজে আর্দ্রতা বেশি থাকলে বীজ শুকিয়ে ঠাণ্ডা করে বীজ প্যাকেট করতে হবে। বীজে পোকামাকড় নেই তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য বীজ প্যাকেটের পূর্বে ফিউমিগেশন করে নেওয়া ভালো। ফসলভিত্তিক বাজারের চাহিদা মোতাবেক বীজ প্যাকেটের সাইজ নির্ধারণ করতে হবে।

গ) বীজ বিপণন: বীজ বপন মৌসুমে বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়কারীর নিকট বীজ প্রেরণ, বিক্রয়োত্তর সেবা/পরামর্শ প্রদান, বিক্রয়কারীর মতামত গ্রহণ এ সবই হলো বীজ বিপণন বা বীজ বাজারজাতকরণের অন্তর্ভুক্ত। কোনো পণ্য বাজারজাতকরণের আগেই ঐ পণ্যের গুণাবলি, মূল্য, বিক্রয়ের স্থান, বিক্রয়ের সময়, ভোক্তা, বাজারের বর্তমান চাহিদা, বিগত কয়েক বছরে বাজারে উক্ত পণ্য কী পরিমাণ বিক্রয় হয়েছে তা যথাযথভাবে বিচার বিশ্লেষণপূর্বক পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের সময়, স্থান, মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। সাধারণত প্রচারেই প্রসার। সুতরাং বীজ বিক্রয়ের জন্য অবশ্যই প্রচারের যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। যাতে সকল ধরনের চাষি মৌসুমের আগেই তার প্রয়োজনীয় বীজের প্রাপ্যতা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

বীজ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সতর্কতা

১) বীজ ফসল উৎপাদনের সময় অবশ্যই নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা।
২) সময়মতো রগিং করা।
৩) সময়মতো বীজ কর্তন করা।
৪) অমসৃণ জায়গার বীজ মাড়াই, ক্লিনিং, গ্রেডিং না করা। এক জাতের বীজ মাড়াই করার পর মাড়াই স্থান এবং মাড়াই মেশিন, ক্লিনিং মেশিন, গ্রেডিং মেশিন ভালোভাবে (১০০%) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার পর অন্য জাতের বীজ মাড়াই করা।
৫) কোনো অবস্থায়ই অতিরিক্ত আর্দ্রতাসম্পন্ন বীজ (ধান বীজের ক্ষেত্রে ১৪% এর বেশি) প্রখর রোদে বা অধিক তাপে ড্রায়ারে না শুকানো। প্রয়োজনে ছায়াযুক্ত পরিবেশে শুকিয়ে বীজের আর্দ্রতা প্রথমে কমিয়ে নেওয়া।
৬) প্রখর রোদে পাকা মেঝের উপর বীজ না শুকানো।
৭) এক জাতের বীজ শুকানোর পর শুকানো স্থান এবং ড্রাইং চেম্বার বা মেশিন ভালোভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না করে অন্য জাতের বীজ না শুকানো।
৮) বীজ গুদাম, বীজ গুদামের চারপাশ সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। প্রয়োজনে মাঝে মাঝে আশেপাশে কীটনাশক স্প্রে করা। তাছাড়া বীজ গুদাম প্রতিবছর একবার রং করা।
৯) রুটিন অনুযায়ী প্রতিদিনই বীজ লট পরিদর্শন করা। অর্থাৎ প্রতিটি বীজ লট প্রতিদিনই নজরে রাখা।
১০) পাক্ষিকভাবে বীজ পরীক্ষণ কার্যসমূহ সম্পাদন করা। পরীক্ষণ ফলাফল বীজ লটসহ সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা।

১১) বীজের গুণগত মান নিশ্চিত হয়ে সরবরাহের জন্য বীজ প্যাকেট করা। কোনো অবস্থায়ই বেশি আর্দ্রতাযুক্ত বীজ, পোকাযুক্ত বীজ প্যাকেট না করা। প্রয়োজনে বীজ প্যাকেটের পূর্বে একবার বীজ ফিউমিগেশন করা।

১২) প্রতিটি বীজ প্যাকেট সঠিকভাবে ওজন করা।

১৩) এক জাতের বীজ প্যাকিং শেষ হওয়ার পর অন্য জাতের প্যাকিং করার পূর্বে অবশ্যই বীজ প্যাকিং স্থান, প্যাকিং মেশিন ভালোভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নেওয়া।

১৪) বীজ সরবরাহকারী ট্রাক ত্রিপল দিয়ে ঢেকে নেওয়া এবং প্রাপক অনুযায়ী ট্রাকে লরিচালন সরবরাহ করা।

ক্ষুদ্র সেচ

বাংলাদেশ একটি কৃষিনির্ভর দেশ। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৫% প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কৃষি কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত এবং তারাই এদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। কৃষির উন্নতি তথা খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য উচ্চ ফলনশীল ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেচ অন্যতম প্রধান উপকরণ। কৃষির সামগ্রিক উন্নয়নে সেচের কোনো বিকল্প নেই। সেচের পানি সুষ্ঠু ব্যবহার করে ফসল উৎপাদনের নিবিড়তা ও ফলন বৃদ্ধির জন্য সুপরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। প্রাচীনকাল থেকেই এ দেশের কৃষকরা কোনো না কোনোভাবে ফসলে সেচ দিয়ে আসছে। বৃষ্টিনির্ভর কৃষির সাথে সনাতন সেচ পদ্ধতির মধ্যে 'দোন' এবং 'সেউতি' ছিল প্রধান। ষাটের দশকের প্রথম দিকে এ দেশে সেচযন্ত্র এবং সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবহারের প্রচলন শুরু হয়। বর্তমানে দেশে দুই ধরনের সেচ ব্যবস্থাপনা চালু আছে, বৃহৎ সেচ ও ক্ষুদ্র সেচ । বাংলাদেশের সেচযোগ্য জমির পরিমাণ ৭.৬ মিলিয়ন হেক্টর। এর মধ্যে সেচযোগ্য জমির প্রায় ৭১% এলাকা শুষ্ক মৌসুমে সেচের আওতায় এসেছে। বোরো মৌসুমে (ডিসেম্বর-মে) দেশের সেচকৃত জমির প্রায় ৯৫% এলাকা ক্ষুদ্র সেচ এবং অবশিষ্ট ৫% এলাকা বৃহৎ সেচ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।

ক্ষুদ্র সেচ কী

কৃষি উৎপাদন আধুনিকীকরণ ও খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে সেচ কার্যক্রমে সমন্বয়, দক্ষ পানি ব্যবস্থাপনা, পানির অপচয় রোধ, সেচ খরচ হ্রাস ও অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সাধারণত স্বল্প এলাকা নিয়ে যে সকল সেচ স্কিম এককভাবে গঠিত হয়, তাই ক্ষুদ্র সেচ স্কিম। যে ব্যবস্থাপনায় এ সকল স্কিম পরিচালিত হয়, তাই ক্ষুদ্র সেচ। খাল, বিল, নদী-নালা, হাওর, বরোপিট ইত্যাদি জলাশয়, পাহাড়ি ছড়ার প্রবাহমান ও জোয়ার-ভাটার ভূপরিস্থ পানি এবং ভূগর্ভস্থ পানি ক্ষুদ্র সেচের উৎস হিসেবে বিবেচিত। ক্ষুদ্র সেচের আওতায় সর্বোচ্চ ১০০০ হেক্টর পর্যন্ত জমি নিয়ে সেচ নিয়ন্ত্রণ এলাকা গঠিত হতে পারে।

সেচের গুরুত্ব

ফসলে সেচ দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি। উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয় যা মূলরোমের সাহায্যে মাটি থেকে শোষণ করে। এ জন্য মাটিতে পানি অত্যাবশ্যক। বর্ষা মৌসুমে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বিধায় এ মৌসুমে সাধারণত সেচের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কোনো সময় হঠাৎ করে বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে মাটির আর্দ্রতা কমে যায়। ফলে ফসলের খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। এতে উদ্ভিদ একসময় নেতিয়ে পড়ে এবং বেশি দিন পানিশূন্যতা হলে গাছ মারা যায় বা কোনো ফলন হয় না। নিম্ন বর্ণিত এক বা একাধিক উদ্দেশ্যে সেচ প্রদান করা হয়ে থাকে:

ক। উদ্ভিদের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য চাহিদা অনুযায়ী পানি সরবরাহ করা;
খ। জমির মাটি কর্দমাক্ত করা;
গ। স্বল্প বা দীর্ঘ খরার হাত থেকে ফসল রক্ষা করা;
ঘ। লবণাক্ত অঞ্চলে মাটির লবণ ধৌত করে এর মাত্রা কমানো;
ঙ। পরিবেশকে শীতল রাখা;
চ। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করা।

ক্ষুদ্র সেচের আধুনিক যন্ত্রপাতি

ভূপরিস্থ বা ভূগর্ভস্থ উৎস হতে সেচের জন্য পানি উত্তোলনে যে যন্ত্রটি মূল ভূমিকা পালন করে তাকে পাম্প বলা হয়। বিভিন্ন প্রকারের পাম্প সেচকাজে ব্যবহৃত হয়। ক্ষুদ্র সেচে সাধারণত তিন ধরনের সেচযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। যথা:

১) লো-লিফট পাম্প
২) গভীর নলকূপ
৩) অগভীর নলকূপ

এ ধরনের সেচযন্ত্রের প্রতিটিতেই পাম্প ব্যবহৃত হয়। পাম্পকে নির্দিষ্ট গতিতে (আরপিএম) ঘুরালে পানির উৎস থেকে পাইপ-এর মাধ্যমে উপরে উঠে সেচনালায় বা জমিতে নির্গত হয়। লো-লিফট পাম্প ও অগভীর নলকূপে সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প ব্যবহৃত হয়। এ পাম্প পাইপকে বায়ুশূন্য করে বাতাসের চাপকে ব্যবহার করে পানি উত্তোলন করে। ফলে সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প দ্বারা তাত্ত্বিকভাবে ৩৪ ফুট এবং ব্যবহারিকভাবে ২০ থেকে ২২ ফুটের অধিক গভীর থেকে পানি উত্তোলন করা যায় না। কিন্তু গভীর নলকূপে টারবাইন পাম্প ব্যবহার করা হয়। যা ভূগর্ভে পানির নিচে স্থাপন করা হয়। এ পাম্প পানিকে ঠেলে উপরে উঠায়। এ জন্য অনেক নিচ থেকে এ পাম্প দ্বারা পানি উত্তোলন করা সম্ভব হয়। যে সকল জায়গায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিদ্যমান সে সব এলাকায় গভীর নলকূপে বর্তমানে সাবমার্সিবল পাম্প ব্যবহৃত হচ্ছে। সাবমার্সিবল পাম্প বৈদ্যুতিক মোটরের সাথে একসঙ্গে সংযোগ করে পানির নিচে স্থাপন করা হয়। এ ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক লাইনের সুইচ অন করার সাথে সাথে পানি উপরে উঠতে থাকে, যেখানে কোনো যন্ত্র দেখা বা কোনো শব্দ শোনা যায় না। আমাদের দেশে লো-লিফট পাম্পের সাহায্যে সাধারণত ২৮ লিটার/সেকেন্ড বা ৫৬ লিটার/সেকেন্ড পানি উত্তোলন করা হয়ে থাকে। এ দ্বারা যথাক্রমে ১০-১২ হেক্টর ও ২০-২৪ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা যায়। অগভীর নলকূপ সাধারণত ১৪ লিটার/সেকেন্ড ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে থাকে। একটি অগভীর নলকূপ দ্বারা ৫ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা যায়। গভীর নলকূপ সাধারণত ৫৬ লিটার/সেকেন্ড ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে থাকে, যা দ্বারা ২৪ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা যায়।

সেচ দক্ষতা

সেচকাজে যে পানি উত্তোলন করা হয় তা পুরোপুরি ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। এ জন্য উত্তোলিত পানির এক বিরাট অংশ বিভিন্নভাবে অপচয় হয়। ফলে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি পানি উৎস থেকে উত্তোলন করা হয়ে থাকে। ফলে ভূ-উপরিস্থ পানি শুকিয়ে যায় এবং ভূগর্ভস্থ পানি অনেক নিচে চলে যায়। পানি নিচে চলে গেলে তা উত্তোলন করতে অধিক শক্তির প্রয়োজন হয়। ফলে সেচ খরচ বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে বর্তমানে সেচ দক্ষতা মাত্র ৩৪ শতাংশ। ৩৪% সেচ দক্ষতা বলতে আমরা বুঝি পানির উৎস থেকে ১০০ লিটার পানি উত্তোলন করা হলে তার মাত্র ৩৪ লিটার ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট পানি অপচয় হয়। সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য সেচনালার উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। নালার মাটি ভালোভাবে ঠেসে দিয়ে কাঁচা সেচনালা ভালোভাবে কম্পেকশন করে তৈরি করতে হয়। বর্তমানে পাকা সেচনালা ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের উপর বেশি গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। ভূগর্ভস্থ সেচনালায় পানির অপচয় খুবই কম হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়
মৎস্য চাষ

মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ মৎস্য খাতে যে সাফল্য অর্জন করেছে তা আজ সারা বিশ্বে স্বীকৃত। অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশ্বে বাংলাদেশের ৫ম স্থান অধিকার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে (এফএও, ২০১৫)। জাতীয় অর্থনীতিতে সম্ভাবনাময় এ খাতের ভূমিকা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। দেশের মোট জিডিপির ৩.৬৯ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপির প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২৩.১২ শতাংশ) মৎস্য খাতের অবদান (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৫)। দেশের রপ্তানি আয়ের ২.০ শতাংশের অধিক আসে মৎস্য খাত হতে। আমাদের খাদ্যে প্রাপ্ত প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ জোগান দেয় মাছ। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ১১ শতাংশের অধিক এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে। তথা এ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বিধান ও নিরাপদ খাদ্য সরবরাহে মৎস্য খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ

মৎস্যসম্পদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে "মৎস্য" কী এ সম্পর্কে অবশ্যই জানা প্রয়োজন। মৎস্য একটি শীতল রক্তসম্পন্ন জলজ প্রাণী। এর শরীরে মেরুদণ্ড, শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য কানকোর নিচে ফুলকা ও জলে বিচরণ করার জন্য পাখনা (Fins) আছে। বিজ্ঞানের পরিভাষায় মৎস্য (Fish) অর্থ সকল প্রকার কোমল অস্থি এবং কঠিন অস্থিবিশিষ্ট মাছ (Cartilaginous and bony fishes), স্বাদু ও লবণাক্ত পানির চিংড়ি (Prawn and Shrimp), উভচর জলজ প্রাণী, কচ্ছপ ও কাঁকড়াজাতীয় (Crustacean), শামুক বা ঝিনুকজাতীয় (Mollusc) জলজ প্রাণী, একাইনোডার্মস জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণী, ব্যাঙ (Frogs) এবং এদের জীবনচক্রের যে কোনো ধাপকে বোঝাবে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের (নদী, বিল ও প্লাবনভূমি, কাপ্তাই লেক, সুন্দরবন) পরিমাণ প্রায় ৩৯ লক্ষ ১০ হাজার হেক্টর, বদ্ধ জলাশয়ের (পুকুর, মৌসুমি চাষকৃত জলাশয়, বাঁওড় ও চিংড়িঘের) পরিমাণ ৭ লক্ষ ৮৯ হাজার হেক্টর, সামুদ্রিক জলসীমার পরিমাণ ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার এবং সমুদ্র উপকূল রয়েছে ৭১০ কিলোমিটার। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ১৯৮৩-৮৪ অর্থবছরে দেশে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ৭.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টন। বিগত তিন দশকের ব্যবধানে এ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৫.৪৮ লক্ষ মেট্রিক টনে। এ সময়ে উপখাতওয়ারি উৎপাদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৯৮৩-৮৪ সালে উন্মুক্ত জলাশয়ের অবদান ৬৩ শতাংশ হলেও ২০১৩-১৪ সালে এ ক্ষেত্রের অংশ দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৮ শতাংশে। অন্যদিকে বদ্ধ জলাশয়ের অবদান বৃদ্ধি পেয়েছে সাড়ে ৩ গুণ। মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও মূলত বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রবৃদ্ধি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হয়নি। দেশের স্বাদু পানির মৎস্য উৎপাদনে সাফল্যের পাশাপাশি বর্তমান সরকারের বিশাল সমুদ্র বিজয়ের প্রেক্ষিতে সামুদ্রিক সম্পদ উন্নয়নে অপরিমেয় সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশের জলাভূমি বিচিত্র মৎস্য প্রজাতিতে ভরপুর। স্বাদু পানি ও লোনা পানিতে নানান প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। মিঠা পানির মৎস্য প্রজাতি ২৬০টি, মিঠা পানির চিংড়ি প্রজাতি ২৪টি এবং সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি ৪৭৫টি ও সামদ্রিক চিংড়ি প্রজাতি রয়েছে ৩৬টি। স্বাদু পানির উৎস হিসেবে নদী, বিল ও প্লাবনভূমি, কাপ্তাই লেক, সুন্দরবন এবং বদ্ধ জলাশয় হিসেবে পুকুর, মৌসুমি চাষকৃত জলাশয়, বাঁওড়, চিংড়িঘের উল্লেখযোগ্য। স্বাদুপানির মৎস্য প্রজাতির মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউশ, ঘনিয়া, বাটা, বোয়াল, পাঙাশ, পাবদা, টেংরা, পুঁটি, কাজলি, গুলসা, চিংড়ি, আইড়, বাঘাইর, সরপুঁটি, মলা, চেলা, দারকিনা, রানীমাছ, বেলে, এলং, শিলং, বাচা, রিটা, ফলি, চিতল, কৈ, শিং, মাগুর, শোল, গজার, টাকি, ভেদা, বাইম, গুচি বাইম, চাপিলা, খলিশা, ফ্যাশা, চান্দা, কাকিলা ইত্যাদি।

মাছেভাতে বাঙালির রসনা মিটাতে এক সময়ের প্রাকৃতিক উৎসের মৎস্যভাণ্ডার হিসেবে খ্যাত কয়েকটি প্রধান নদ-নদীর নাম বিশেষভাবে উলেখযোগ্য। তন্মধ্যে পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও কর্ণফুলীর নাম অন্যতম।

পদ্মাঃ পদ্মা বাংলাদেশের প্রধান নদী। হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হতে উৎপন্ন হয়ে গঙ্গার একটি ধারা ভাগীরথী নাম নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও পরে হুগলী নামে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। অন্য শাখাটি 'পদ্মা' নামে রাজশাহীর রামপুর-বোয়ালিয়ার ভিতর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এটি গোয়ালন্দের নিকট ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা যমুনার সাথে মিশেছে। ভৈরব, আড়িয়াল খাঁ, মাথাডাঙ্গা, কুমার, গড়াই ও মধুমতি, পদ্মার প্রধান শাখা নদী। কপোতাক্ষ ও পশুর নদ ভৈরব নদের উপশাখা।

যমুনাঃ বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী। এ নদীর প্রবাহিত ধারা আরও দক্ষিণে চাঁদপুরের নিকটে মেঘনার সাথে মিলিত হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করে মিশেছে সমুদ্র সঙ্গমে।

মেঘনাঃ মেঘনা বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম নদী। আসামের বরাক নদী দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে সুরমা ও কুশিয়ারা নামে সিলেট জেলায় বাংলাদেশের মাটির পরশ লাভ করেছে। পরে ঐ জেলার আজমিরীগঞ্জের নিকট দুইটি মিলিত শাখা কালনী নামে ভৈরব বাজারের নিকট পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হয়ে চাঁদপুরের নিকট পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে। এরপর মেঘনা নামেই বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। তিতাস ও ডাকাতিয়া নদী মেঘনার প্রধান শাখা নদী। মেঘনার মোহনায় ব-দ্বীপ সৃষ্টি হয়েছে।

ব্রহ্মপুত্রঃ তিব্বতের মানস সরোবর হতে উৎপন্ন হয়ে আসামে প্রবেশ করেছে এবং পরে আসামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রংপুর জেলায় প্রবেশ করে প্রধান ধারায় বিভক্ত হয়েছে। প্রধান ধারাটি যমুনা নামে রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগের মধ্যে দিয়ে গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সঙ্গে মিশেছে। মূল ধারাটি ব্রহ্মপুত্র নামে (এখন শুষ্ক প্রায়) ময়মনসিংহের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ঢাকা জেলার উত্তর-পূর্ব ভাগে মেঘনার সাথে মিশেছে। এ ধারা পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত। প্রধান ধারা যমুনার উপনদীসমূহের মধ্যে তিস্তা, আত্রাই, করতোয়া প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ধলেশ্বরীও যমুনার শাখা। আবার ধলেশ্বরীর শাখা ঢাকার বুড়িগঙ্গা। পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের শাখা হিসেবে নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যার নামও উল্লেখযোগ্য।

কর্ণফুলীঃ লুসাই পাহাড়ের খরস্রোতা প্রস্রবণ কর্ণফুলী নামে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। ফেনী, হালদা, ইছামতি, কাচালং, চেংগী, সাংগু ও মায়ানী প্রভৃতি কয়েকটি পার্বত্য নদী চট্টগ্রামের পাহাড় থেকে কর্ণফুলী নদীতে প্রবাহিত হয়। হালদা নদীটি রুই-কাতলা মাছের 'প্রজনন ক্ষেত্র' হিসেবে এখনও বিখ্যাত।

কাপ্তাই লেক: কাপ্তাই লেক মনুষ্যসৃষ্ট বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ স্বাদু পানির জলাধার। মূলত এটি কর্ণফুলী নদীর উপর কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ (Hydro electric power generation) প্রকল্প তৈরির জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। ইহা চট্টগ্রাম বিভাগের আওতাধীন রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলায় অবস্থিত। কাপ্তাই লেকের সর্বমোট আয়তন ৬৮,৮০০ হেক্টর। এর গড় গভীরতা ১০০ ফুট (৩০ মিটার) এবং সর্বোচ্চ গভীরতা ৪৯০ ফুট (১৫০ মিটার)। প্রকল্প নির্মাণকাজ ১৯৬২ সালে সমাপ্ত হয়। লেকটিকে মৎস্য সম্পদের অঢেল আধার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। Aquatic Research Group (ARG) 1986 পরিসংখ্যানমতে কাপ্তাই লেকে ৪৯ প্রজাতির দেশি মাছ এবং ৫ প্রজাতির বিদেশি মাছ পাওয়া যায়। অন্য পরিসংখ্যানে দেখা যায়, কাপ্তাই লেকে ৭১ প্রজাতির মাছের মধ্যে বিদেশি ৫ প্রজাতির মাছ ও চিংড়ির দুইটি প্রজাতির মাছ শনাক্ত করা হয়েছে, Halder et ol (1991)। রুইজাতীয় মাছ আগে মোট উৎপাদনের শতকরা ৬০ ভাগ হলেও বর্তমানে তা কমে ৪.২% এ নেমে এসেছে। পক্ষান্তরে চাপিলা (*Gudusia chapra*) এবং কেচকি (*Corica soborna*) মাছ হতে মোট উৎপাদনের ৫০% সরবরাহ হয়ে থাকে। এ ছাড়া কাতলা, মৃগেল, রুই, কালবাউশ, ঘনিয়া, বোয়াল, চিতল, মলা, আইড়, বাটা, তেলাপিয়া মাছ অধিক হারে পাওয়া যায়।

চলন বিল: উত্তরাঞ্চলের অহংকার চলন বিল এ দেশের একটি সুপরিচিত ও ঐতিহ্যবাহী বিল। রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও বগুড়া জেলার অংশবিশেষ নিয়ে বিস্তৃত চলন বিলের আয়তন বর্ষাকালে প্রায় ৪০ হাজার হেক্টর এবং শুষ্ক মৌসুমে প্রায় ৭ হাজার হেক্টর। চলন বিলে পূর্ব মাধনগর, পিপরুল, ডাংগাপাড়া, তাজপুর, চলন, মাজগাঁও, বইসা, চনমোহন, সাতাইল, খাসদহ, গজনা, সোনাপাতিলা, ঘুঘুদহ, কুরালিয়া, চিরল, দিক্ষী ইত্যাদি ছোট ছোট বিল এবং আত্রাই, গুর, করতোয়া, বড়াল, তুলসী, ভাদই, চিকনাই, তেলকুপি, বগঞ্জা ইত্যাদি নদী ও তাদের শাখা-প্রশাখাসহ বহু খাল ও প্লাবনভূমি রয়েছে। চলন বিলের মৎস্যসম্পদ একসময় প্রবাদ বাক্যের মতো সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী ছিল। বহু বছরের ঐতিহ্য নিয়ে বিস্তৃত এ চলন বিল ধীরে ধীরে পলি দ্বারা ভরাট হয়ে বর্তমানে পরিণত হয়েছে এক বিস্তৃত কৃষিজমিতে, বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে। কালের বিবর্তনে চলন বিল হারাতে বসেছে তার পুরনো ঐতিহ্য। কাজেই চলন বিলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পাশাপাশি মৎস্যসম্পদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজন অবক্ষয়িত আবাসস্থল পুনরুদ্ধার ও সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে জলাশয়ের জৈবিক ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন।

মৎস্য খাতের সাফল্য ও উন্নয়ন সম্ভাবনা

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান: সরকারের মৎস্যবান্ধব কার্যক্রম পরিচালনা এবং চাষি ও উদ্যোক্ত পর্যায়ে চাহিদাভিত্তিক কারিগরি পরিষেবা প্রদানের ফলে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৩৫.৪৮ লক্ষ মে.টন। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ২৭.০১ লক্ষ মে.টন। সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদনের ঈপ্সিত লক্ষ্যমাত্রা ৩৭.০৩ লক্ষ মে.টন অর্জিত হবে বলে প্রাথমিক তথ্যে প্রতীয়মান হয়। বিগত ১০ বছরের দেশের মৎস্য উৎপাদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ খাতে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি উৎসাহব্যঞ্জক (গড় প্রবৃদ্ধি ৫.৩৮ শতাংশ) এবং বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হারে স্থিতিশীলতা বিরাজমান (মৎস্যসম্পদ জরিপ পদ্ধতি, ২০১৪)। প্রবৃদ্ধির এ ক্রমধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০২০-২১ সালের মধ্যে দেশে মৎস্য উৎপাদন ৪৫.৫২ লক্ষ মে.টন অর্জিত হবে বলে আশা করা যায়। ফলে ২০২০-২১ সালে দেশের বর্ধিত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রক্ষেপিত মৎস্য চাহিদা ৪৫.২৮ লক্ষ মে.টন পূরণ করা সম্ভব হবে।

দেশের ১৪ লক্ষের বেশি নারীসহ প্রায় ১ কোটি ৭৮ লক্ষ লোক মৎস্য খাতের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে তাঁদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে, যা দেশের মোট জনসংখ্যার ১১ শতাংশের অধিক। মৎস্য খাত সংশ্লিষ্ট এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় ১০ শতাংশ নারী, যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১ শতাংশ। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায়, বর্তমানে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাসমূহে নিয়োজিত শ্রমিকের ৮০ শতাংশের অধিক নারী। দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিগত ৫ বছরে এ সেক্টরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বার্ষিক অতিরিক্ত ৬ লক্ষাধিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বদ্ধ জলাশয়ে (পুকুর, দিঘি, বাঁওড়) মৎস্য চাষ নিবিড়করণ: মৎস্য অধিদপ্তরের লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর ও চাহিদাভিত্তিক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইতোমধ্যে রুইজাতীয় মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পাঙাশ, কৈ, শিং, মাগুর ও তেলাপিয়া মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। প্রশিক্ষিত ও দক্ষ সম্প্রসারণ কর্মীর মাধ্যমে মাছ চাষের আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে চাষি প্রশিক্ষণ, উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর, লাগসই সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, প্রদর্শনী খামার পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে দেশের ৩.৭১ লক্ষ হেক্টর পুকুর-দিঘিতে বার্ষিক হেক্টরপ্রতি গড় মৎস্য উৎপাদন প্রায় ৪.১ মে. টনে উন্নীত হয়েছে। চাহিদাভিত্তিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের সব পুকুর-দিঘি লাগসই মাছ চাষের আওতায় আনা সম্ভব হলে ২০২০-২১ সালের মধ্যে হেক্টরপ্রতি মৎস্য উৎপাদন ৫.০ মে.টনে উন্নীত করা সম্ভব।

নিমগাছি সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ প্রকল্প: উত্তরাঞ্চলের অপার সম্ভাবনাময় খাস জলজ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার আপামর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের নিমিত্ত সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ ও তাড়াশ এবং পাবনা জেলার চাটমোহর ও ভাঙ্গুড়া উপজেলার প্রায় ৬৭৪.৭৬ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট ৭৮৩টি (চাষকৃত পুকুরের সংখ্যা ৫৪৬টি) সরকারি পুকুর-দিঘি নিয়ে নিমগাছি সামাজভিত্তিক মৎস্য চাষ প্রকল্প। বিগত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে চাষকৃত ৫৪৬টি পুকুর হতে ১৭৫০ মে.টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে।

বাঁওড় ব্যবস্থাপনা: দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ৫৪৮৮ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট প্রায় ৬০০টি বাঁওড় রয়েছে। বাঁওড়গুলোতে কাঙ্ক্ষিত হারে মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য সরকার ঝিনাইদহ ও যশোর জেলার ৬টি বাঁওড় মৎস্য অধিদপ্তরে হস্তান্তর করেছে। এ সব বাঁওড়ে সুফলভোগী দল গঠনের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এসব বাঁওড় থেকে মোট ৫৬৬ মে.টন মাছ উৎপাদনসহ বাঁওড়ের মোট উৎপাদন ৭২৬৭ মে.টন-এ উন্নীত হয়েছে।

পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ: চিংড়ি বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান রপ্তানি মৎস্যপণ্য। নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে ট্রেসিবিলিটি নিশ্চিতকরণে ইতোমধ্যে ২ লক্ষ ৭ হাজার চিংড়িঘের রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। ২০১৪ সালে কক্সবাজার জেলায় সীমিত পরিসরে আধানিবিড় পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ি চাষ শুরু করা হয়েছে। এ কার্যক্রম শুরুর প্রথম বছরেই এ সকল খামার থেকে হেক্টরপ্রতি ৭.২ মে.টন বাগদা চিংড়ি উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। সরকার কর্তৃক চিংড়ি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নকল্পে জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা, ২০১৪ অনুমোদিত হয়েছে।

ইলিশ উৎপাদন ব্যবস্থাপনা কৌশল: বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ। এর বাসভূমি সাগরে এবং এটি লবণাক্ত পানির মাছ। যদিও এর বাস সাগরের পানিতে তবু সারা বছরই এ দেশের স্বাদুপানির নদ-নদীতে প্রচুর পরিমাণে ইলিশ পাওয়া যায়। ইলিশের প্রধান প্রজননকাল আশ্বিন ও কার্তিক মাস হলেও সারা বছরই ইলিশ মাছ ডিম ছেড়ে থাকে। জাতীয় মাছ ইলিশ আমাদের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। অনাদিকাল থেকেই আমাদের জাতীয় অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও আমিষজাতীয় খাদ্য সরবরাহে এ মাছ অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে ইলিশ মাছের অবদান প্রায় ১১% এবং বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৩.৮৫ লক্ষ মে.টন (২০১৩-১৪) যার বাজারমূল্য প্রায় ১৭,০০০ কোটি টাকার উর্ধ্বে। জিডিপিতে ইলিশ মাছের অবদান প্রায় ১%।

বিগত কয়েক দশকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে (নদ-নদীর নব্যতা হ্রাস, পরিবেশ বিপর্যয়, নির্বিচারে জাটকা নিধন ও অধিক মাত্রায় ডিমওয়ালা ইলিশ আহরণ) ইলিশের উৎপাদন দ্রুত হ্রাস পায়। এ মাছের উৎপাদন সহনশীল

অভয়াশ্রমের নাম	মাছ ধরার নিষিদ্ধ সময়
১. নিম্ন মেঘনা নদী	মার্চ ও এপ্রিল (মধ্য ফাল্গুন হতে মধ্য বৈশাখ)
২. শাহবাজপুর চ্যানেল	ঐ
৩. তেঁতুলিয়া নদী	ঐ
৪. আন্ধারমানিক নদী	নভেম্বর-জানুয়ারি (মধ্য কার্তিক হতে মধ্য মাঘ)
৫. পদ্মা নদীর নিম্নাংশ	মার্চ ও এপ্রিল (মধ্য ফাল্গুন হতে মধ্য বৈশাখ)

সারণি: অভয়াশ্রম এলাকা ও মাছ ধরার নিষিদ্ধ সময়

পর্যায়ে বজায় রাখতে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা কৌশল যেমন- জাটকা সংরক্ষণ, সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমে ইলিশ মাছ আহরণ নিষিদ্ধ, অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইলিশ মাছ সারা বছরই কম-বেশি প্রজনন করলেও সবচেয়ে বেশি প্রজনন করে অক্টোবর মাসের (আশ্বিন/কার্তিক) বড় পূর্ণিমার সময়। এ সময় শতকরা ৬০-৭০ ভাগ ইলিশ মাছই পরিপক্ক ও ডিম ছাড়ার উপযোগ্য অবস্থায় থাকে। আর এ সময়েই সবচেয়ে বেশি পরিমাণ (মোট ধৃত মাছের ৫০-৬০%) মাছ ধরা পড়ে। একই সাথে বছরের বেশির ভাগ সময়ে নির্বিচারে প্রচুর পরিমাণে জাটকা ধরা হয়। ফলে ইলিশ মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও নতুন প্রজন্মের প্রবেশ ব্যাপকভাবে ব্যাহক হচ্ছিল। তাই ইলিশ মাছের অবাধ প্রবেশ নিশ্চিতকরণের জন্য ৫টি নির্দিষ্ট এলাকা অভয়াশ্রম ঘোষণা করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, তেমনি অবাধ প্রজনন ও প্রাকৃতিকভাবে অধিক ডিম ও পোনা উৎপাদনের জন্য 'মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০' এর অধীনে সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমে প্রধান প্রজনন এলাকায় ১৫ দিন ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা, জাটকার বিচরণক্ষেত্র ও ইলিশের প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ এবং ইলিশের আবাসস্থল নদী-মোহনার ইকোলজি বিষয়ে বিএফআরআই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। উক্ত গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে নদীর পরিবেশ, জাটকা সংরক্ষণ ও অভয়াশ্রম বাস্তবায়নের প্রভাবে ক্রমাগত ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।

জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশ সম্পদ উন্নয়নঃ বাংলাদেশে মোট উৎপাদিত মাছের এক-দশমাংশের অধিক আসে শুধু ইলিশ থেকে। কাজেই একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ। সর্বোপরি উপকূলীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকা নির্বাহে ইলিশের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতীয় মাছ ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় প্রশাসন, কোস্টগার্ড, পুলিশ ও নৌবাহিনীর সহায়তায় মৎস্য অধিদপ্তর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনা করে আসছে। ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম কৌশল হচ্ছে জাটকা সংরক্ষণ ও মা ইলিশ রক্ষা।

পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম ও বিল নার্সারি স্থাপনঃ জলাশয় ভরাট, দূষণ, মাছের অতি আহরণ, প্রাকৃতিক উৎস থেকে পোনা সংগ্রহ, বিদেশি প্রজাতির মাছ অন্তর্ভুক্তি, কৃষিজমিতে নির্বিচারে কীটনাশকের ব্যবহার ইত্যাদি কারণে মুক্ত জলাশয়ের ক্রমহ্রাসমান মাছের প্রাচুর্যসমৃদ্ধকরণ ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তি ও বিল নার্সারি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিগত ছয় বছরে মোট পোনামাছ অবমুক্তির পরিমাণ প্রায় ৪ হাজার মে.টন। পোনামাছ অবমুক্তি কার্যক্রমের ফলে অতিরিক্ত প্রায় ৪১ হাজার মে.টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে। উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তি কার্যক্রমের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় দেশব্যাপী প্রায় ৯৪১ মে.টন গুণগত মানসম্পন্ন ও বিপন্নপ্রায় প্রজাতির পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বার্ষিক প্রায় সাত হাজার মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হচ্ছে এবং ইতোমধ্যেই অনেক বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির মাছের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে।

সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনঃ অভ্যন্তরীণ জলসম্পদের স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন, জলাশয় সংশ্লিষ্ট জেলে ও মৎস্যজীবীসহ সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জলাশয়ের জৈবিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জলাশয় সংশ্লিষ্ট জেলে ও সুফলভোগী সমন্বয়ে সমাজভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, প্রজনন, বংশবৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য অভয়াশ্রম স্থাপন একটি অন্যতম কারিগরি কৌশল। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২৩৯টি অভয়াশ্রম স্থাপনসহ মোট ৫০০টির অধিক অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে। স্থাপিত অভয়াশ্রমসমূহ স্থানীয় সুফলভোগী কর্তৃক সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে। মৎস্য অভয়াশ্রমে সমাজভিত্তিক

২০১৫

মৎস্য ব্যবস্থাপনার ফলে মাছের বিচরণক্ষেত্র সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও নিরাপদ আবাসস্থল সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে সংকটময় মূহুর্তে প্রাকৃতিক উৎসে ব্রুড মাছ ও পোনা সুরক্ষা পাচ্ছে; একই সাথে বিলুপ্তপ্রায় ও বিপন্ন প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে অভয়াশ্রম সংশ্লিষ্ট হাওর, বাঁওড়, নদী, খাল ও প্লাবনভূমিতে মাছের উৎপাদন ও প্রাচুর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতি, যথা- চিতল, ফলি, বামোশ, কালবাউস, আইড়, টেংরা, মেনি, রাণী, সরপুঁটি, মধু পাবদা, রিটা, কাজলি, চাকা, গজার, তারা বাইম ইত্যাদি মাছের তাৎপর্যপূর্ণ পুনরাবির্ভাব ঘটেছে এবং প্রাপ্যতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। অভয়াশ্রমে দেশি কৈ, শিং, মাগুর, পাবদা ইত্যাদির পোনা ছাড়ার ফলে এসব মাছের প্রাচুর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার ফলে সংশ্লিষ্ট জলাশয়সমূহে মাছের উৎপাদন ১৪০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি লক্ষ করা গেছে।

প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণঃ রুই-কাতলাজাতীয় মাছের স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদ নদী, লবণাক্ত ও আধা-লবণাক্ত মাছের অন্যতম চারণক্ষেত্র সুন্দরবনের মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে মৎস্য অধিদপ্তর নিবিড় কার্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। সরকার প্রাকৃতিক পোনার উৎসস্থল হালদা নদী রক্ষায় নানামুখী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে। সরকারের সময়োপযোগী দিকনির্দেশনায় ২০১০ সালে হালদা নদীর উজানে ফটিকছড়ি অংশের নাজিরহাট ব্রিজ থেকে নদীর ভাটির অংশে হালদা-কর্ণফুলীর সংযোগস্থলসহ কালুরঘাট ব্রিজ পর্যন্ত প্রায় ৪০ কি.মি. মাছের অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। অভয়াশ্রমে সব ধরনের মাছ ধরা নিষিদ্ধকরণ, নদীর তীরবর্তী স্থানে হ্যাচারি স্থাপন, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান, বনায়ন ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন নির্বিঘ্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ২০১১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৫ বছরে হালদা নদী থেকে মোট ৩ হাজার ৪২ কেজি কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধ মানের রেণু সংগ্রহ করা হয়; যার বার্ষিক গড় উৎপাদন প্রায় ৬০৯ কেজি। উল্লেখ্য যে, উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে ২০০৭ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত ৪ বছরে মোট উৎপাদন ছিল মাত্র ৮৩২ কেজি (গড় উৎপাদন ২০৮ কেজি)।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনাঃ বর্তমান সরকারের দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারিত হওয়ায় ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গ কি.মি. এলাকায় মৎস্য আহরণে আইনগত ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে নতুন নতুন মৎস্য আহরণক্ষেত্র চিহ্নিত করে তলদেশীয় ও ভাসমান মৎস্য আহরণের এক দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। উপকূলব্যাপী ৭১০ কি.মি. দীর্ঘ তটরেখা থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত একান্ত অর্থনৈতিক এলাকায় সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের বিশাল সুযোগ রয়েছে। সমুদ্রের বিশাল জলরাশির মৎস্য সম্পদের মধ্যে রূপচান্দা, ছুরি, ভেটকি, কোরাল, লইট্যা ইত্যাদি মাছই প্রধান। রূপচান্দা খেতে খুবই সুস্বাদু এবং এর চাহিদাও অনেক বেশি। বঙ্গোপসাগরের উপকূলভাগে যে সব মাছ পাওয়া যায় তন্মধ্যে রূপচান্দা, ভেটকী, পায়রা চান্দা, চান্দা, মেটে মাছ, ছুরি মাছ, বেলে মাছ, বামোশ, কামিলা, ইলিশ, চৌক্কা, সাগর মাগুর, সাগর কাউন, পাঙাশ, লটিয়া, একটুঁইট্যা, কোরাল, লাল দাতিনা, খল্লা, তাপসী, হ্যালিবাট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অভ্যন্তরীণ মৎস্য সম্পদের ন্যায় সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মৎস্যজীবীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী মোট ৬৭,৬৬৯টি যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযান মৎস্য আহরণে নিয়োজিত। প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার মৎস্যজীবী পরিবারের ন্যূনতম ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষের জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে। উপকূলীয় সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মাধ্যমে মৎস্য আহরণে মোট ২০৫টি ও চিংড়ি আহরণে মোট ৩৭টি ট্রলার অর্থাৎ সর্বমোট ২৪২টি বাণিজ্যিক ট্রলার বর্তমানে বঙ্গোপসাগরে মৎস্যসম্পদ আহরণে নিয়োজিত রয়েছে।

Blue Growth Economy নামে অভিহিত সমুদ্র অর্থনীতিতে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ Pilot Country হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যথাযথ সংরক্ষণ ও সহনশীল মাত্রায় আহরণের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের মৎস্যসম্পদের স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও স্থায়িত্বশীল প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বর্তমান ট্রলার বহরের সকল বটম ট্রলার মিডট্রলারে রূপান্তরসহ নতুন বটম ট্রলার ও সামুদ্রিক চিংড়ি ট্রলার সংযোজন রহিতকরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া বাণিজ্যিক ট্রলার কর্তৃক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত জেলেদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যঝুঁকি হ্রাস, আহরিত মাছের আহরণোত্তর পরিচর্যা এবং সুষ্ঠু সংরক্ষণ নিশ্চিতকল্পে কাঠ বডি নন-ফ্রিজ ট্রলার নির্মাণ ও আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি: আন্তর্জাতিক বাজারে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ৩টি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ল্যাবে মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত এ ৩টি মৎস্য মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত অ্যাক্রিডিটেশন সনদ অর্জনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হয়েছে। চিংড়ি সেক্টরে ট্রেসিবিলিটি সিস্টেম কার্যকর করার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যেই প্রায় ২ লক্ষ ৭ হাজার চিংড়ি খামার ও ৯৬২৪টি বাণিজ্যিক ফিন ফিশ (প্রধানত পাঙাশ, কৈ, তেলাপিয়া ও শিং-মাগুর) এর খামার রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। বিশ্ববাজারে আর্থিক মন্দাবস্থা থাকা সত্ত্বেও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৮৩ হাজার ৫২৪ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে দেশ আয় করেছে ৪ হাজার ৬৬০ কোটি টাকা। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ২০০৩-০৪ সালে প্রায় ৫৪ হাজার মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে দেশ ২ হাজার কোটি টাকা আয় করেছে।

মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে সমস্যা ও উন্নয়ন কৌশল

মাছের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানো, অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের ক্রমধারায় চিহ্নিত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ক. অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়

১. সরকারি বদ্ধ জলাশয়ের ব্যবহার অধিকার ও প্রাপ্যতা সম্পর্কে নীতিমালার অভাব,
২. বেসরকারি পুকুর-দিঘির যৌথ মালিকানা,
৩. জলাশয়ের পানির প্রতিযোগিতামূলক আন্তঃখাত ব্যবহার,
৪. দরিদ্র পুকুর মালিকদের পর্যাপ্ত পুঁজির অভাব,
৫. গুণগত মানসম্পন্ন পোনা ও মৎস্য খাদ্যের অভাব,
৬. উৎপাদন সামগ্রী ও যন্ত্রপাতির অভাব এবং অধিক মূল্য,
৭. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তির অপর্যাপ্ততা,

৮. মৎস্য চাষে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের অপ্রতুলতা,
৯. চাহিদামাফিক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা ইত্যাদি।

খ. অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়

১. মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য আহরণ সংক্রান্ত সঠিক তথ্যের অপ্রতুলতা;
২. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়হীন ও অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রম;
৩. কৃষিজমিতে অতিরিক্ত সেচ;
৪. অপরিকল্পিতভাবে কীটনাশকের ব্যবহার,
৫. বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও রাস্তাঘাট নির্মাণ,
৬. শিল্পায়নের বর্জ্য দ্বারা জলাশয়ের পানি দূষণ,
৭. নদী বা সংযোগ খাল পলি দ্বারা ভরাট হয়ে যাওয়ার ফলে প্রাকৃতিকভাবে মাছের মজুদ ও বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি,
৮. মৎস্য প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্রগুলো বিনষ্ট হওয়া ইত্যাদি।

গ. উপকূলীয় চিংড়ি চাষ ও ব্যবস্থাপনা

১. গুণগত মানসম্পন্ন চিংড়ির পোনা ও উৎপাদন সামগ্রীর অপ্রতুলতা,
২. উপযুক্ত মৌলিক অবকাঠামোর অভাবে নিবিড় ও আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা সমস্যা,
৩. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘন ঘন প্রাকৃতিক দূর্যোগসহ উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশগত অবক্ষয়,
৪. চিংড়ি পোনা আহরণের সময় অন্যান্য মাছ ও চিংড়ির পোনার ব্যাপক মৃত্যু,
৫. চিংড়ির রোগবালাই,
৬. চিংড়ি চাষে উচ্চ বিনিয়োগ খরচ,
৭. ভূমি ব্যবহারে আন্তঃখাত প্রতিযোগিতা,
৮. চাষ ব্যবস্থাপনায় নিরাপত্তার অভাব,
৯. প্রযুক্তি প্রয়োগ সংক্রান্ত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা,
১০. উপকূলীয় এলাকায় সমন্বিত নীতিমালার অভাব,
১১. খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে চিংড়ি চাষি ও ব্যবসায়ীদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও অবহেলা,
১২. প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবলের অভাব ইত্যাদি।

ঘ. সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ

১. মাছের মজুদ সম্পর্কে সীমিত তথ্য ও কারিগরি জ্ঞানের অভাব,
২. উপকূলবর্তী এলাকায় অতিমাত্রায় মাছ ও চিংড়ি আহরণের ফলে মজুদের মারাত্মক ক্ষতি সাধন,
৩. মাছ আহরণে অবৈধ জালের ব্যবহার,
৪. অপরিকল্পিতভাবে ডিমার্সেল ও পেলাজিক মাছের আহরণ,
৫. পেলাজিক মাছ আহরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির অভাব,
৬. যুগোপযোগী ব্যবস্থাপনা নীতির অভাব,
৭. ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা,
৮. আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ও পরিবহনের অপ্রতুলতা ইত্যাদি।

উন্নয়ন কৌশল

ক. অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়

১. স্থানীয় মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মীর মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং মৎস্য সম্প্রসারণ সেবা ইউনিট ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃতকরণ;
২. মৎস্য/চিংড়ি চাষ প্রদর্শনী খামার স্থাপনের মাধ্যমে উন্নততর চাষ পদ্ধতির প্রচলন;
৩. সরকারি বদ্ধ জলাশয়ের ব্যবহারের অধিকার ও প্রাপ্যতা সম্পর্কে নীতিমালা প্রণয়ন;
৪. ব্রুড মাছের জাত উন্নয়ন, জিনপুল প্রতিষ্ঠা ও গুণগত মানসম্পন্ন পোনার প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ;
৫. মঙ্গাকবলিত এলাকায় মৎস্যবিষয়ক কার্যক্রম জোরদারকরণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আপৎকালীন জীবিকায়নের লক্ষ্যে খাদ্য সহায়তাসহ পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ;
৬. মৎস্য খাদ্য ও খাদ্য উপকরণের মান নিশ্চিতকরণ;
৭. মাছ ও চিংড়ির রোগ নিরাময় ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় কারিগরি সহায়তা প্রদান;
৮. মৎস্যচাষিদের জন্য সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ;
৯. গবেষণার মাধ্যমে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ;
১০. উৎপাদিত পণ্যের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংরক্ষণ ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।
১১. মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
১২. ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা;
১৩. মৎস্যসম্পদ জরিপ কার্যক্রম জোরদারকরণ।

খ. অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়

১. মাছের প্রাকৃতিক আবাসস্থল পুনরুদ্ধার ও অভয়াশ্রম স্থাপন কার্যক্রম জোরদারকরণ;
২. বর্তমানে চালু জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা পরিবর্তন/পরিমার্জন করে অভ্যন্তরীণ জলমহালে জৈবিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
৩. সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও মৎস্যজীবীদের সমন্বয়ে দেশব্যাপী বিভিন্ন এলাকায় সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ;
৪. মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে দাদনদারদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আর্থিক/উপকরণ সহায়তা প্রদান এবং সংগঠিত করে পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধ করা;
৫. খাস জলাশয়ে দরিদ্র মৎস্যজীবীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ। প্রবাহমান নদীর মৎস্য আহরণ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে মৎস্যজীবীদের অধিকারপত্র/লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
৬. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়হীন ও অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রম বন্ধ করার সাথে সাথে জলজ পরিবেশের অবক্ষয় ও দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ;
৭. বিল নার্সারি কার্যক্রম গ্রহণ ও মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ;
৮. মৎস্য সংরক্ষণ আইন সংশোধন এবং বাস্তবায়ন অধিকতর জোরদারকরণ;
৯. উপযুক্ততা নিরূপণ সাপেক্ষে ঘের, পেন ও খাঁচায় মাছ চাষ সম্প্রসারণ;
১০. প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ ও ব্যবস্থপনার ক্ষেত্রে অর্জিত উত্তম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্প্রসারণ ও সম্পদ সংরক্ষণের জন্য গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা;

১১. মৎস্যজীবীদের জীবিকা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিকল্প কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ এবং জোরদারকরণ;
১২. ইলিশ মাছের অভিপ্রায়ণ ও মজুদ নিরূপণ সংক্রান্ত সমীক্ষা পরিচালনা। তাছাড়া উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য আহরণ ও মজুদ সংক্রান্ত ডাটাবেইজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে জরিপ কাজ পরিচালনা;
১৩. মৎস্য খাদ্য, মৎস্য হ্যাচারি, মৎস্য কোয়ারেনটাইন এবং মৎস্য অভয়াশ্রম আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
১৪. আধা লবণাক্ত পানি এলাকায় মাছ চাষ সম্প্রসারণ।

গ. উপকূলীয় চিংড়ি চাষ ও ব্যবস্থাপনা

১. চিংড়ি চাষ এলাকা ঘোষণা ও চিংড়ি চাষ এলাকার মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন;
২. পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ ও চাষ নিবিড়করণ;
৩. চিংড়ি চাষ ও ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে উত্তম চাষ পদ্ধতি ও উত্তম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রবর্তন;
৪. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে হ্যাসাপ ও ট্রেসিবিলিটি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের মাঝে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি;
৫. সমুদ্র থেকে মা চিংড়ি সংগ্রহ কার্যক্রম উন্নয়ন;
৬. মোহনা ও উপকূলীয় এলাকায় কিশোর চিংড়ি আহরণ নিষিদ্ধকরণ;
৭. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ঘন ঘন দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষার গণসচেতনতা সৃষ্টি;
৮. সুন্দরবন এলাকার মৎস্য নার্সারি ও প্রজনন ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সংরক্ষণ;
৯. গবেষণার মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ;
১০. উপকূলীয় এলাকার জনগণকে চিংড়ি চাষ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জড়িত করাসহ সম্প্রসারণ ও সম্পদ সংরক্ষণের জন্য গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা।

ঘ. সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ

১. জরিপের মাধ্যমে পেলাজিক এবং ডিমার্সেল মাছের মজুদ নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রণয়ন;
২. যান্ত্রিক নৌযানে কর্মরত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি;
৩. সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মনিটরিং, কন্ট্রোল ও সার্ভেল্যান্স বা এমসিএস কৌশল প্রবর্তন;
৪. উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের স্থায়িত্বশীল জীবিকায়নের সুযোগ সৃষ্টি;
৫. আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন মৎস্য অবতরণকেন্দ্র স্থাপন এবং নিরাপদ ও সহজ পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
৬. জলযান নিবন্ধন ও মাছ ধরার অনুমতি প্রদানে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ
৭. সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে যুগোপযোগী ব্যবস্থাপনা নীতির প্রবর্তন ।

ধান ক্ষেতে মাছ চাষ

ধান ক্ষেতে নির্দিষ্ট সময় ধরে বর্ষার পানি জমে থাকে যা মাছ চাষের জন্য একটি আদর্শ পরিবেশ। ধান ক্ষেতে ব্যবহৃত সার, গোবর ইত্যাদি পানি ও মাটির সাথে মিশে প্রাকৃতিকভাবে খাবার তৈরি করে যা মাছ চাষ উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ধান ক্ষেতে মাছ চাষের প্রযুক্তি ব্যবহার করে একজন চাষি ধান উৎপাদনের সাথে সাথে বাড়তি আয়ও করতে পারে। আমন ও বোরো দুই মৌসুমেই ধান ক্ষেতে মাছ চাষ করা সম্ভব। তবে আমন মৌসুমে ধান ক্ষেতে মাছ চাষ বেশি লাভজনক। সেচ সুবিধার আওতাধীন যে সমস্ত ধানি জমি রয়েছে সে সকল জমিতে স্বল্প ব্যয়ে এবং অল্প পরিশ্রমে ধানের পাশাপাশি মাছ উৎপাদন করা সম্ভব। ধান ক্ষেতে মাছ চাষ প্রযুক্তি গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শুধু বাড়তি অর্থই জোগান দেয় না সেই সাথে তাদের পুষ্টিও নিশ্চিত করে।

ধান ক্ষেতে মাছ চাষের সুবিধা

- একই জমি থেকে ধানের সাথে অতিরিক্ত ফসল হিসেবে মাছ পাওয়া যায়; সুতরাং জমির সর্বোত্তম ব্যবহার সম্ভব।
- ধান ক্ষেতে আগাছা কম জন্মে এবং অনিষ্টকারী পোকা-মাকড় মাছ খেয়ে ফেলে। ফলে ধান ক্ষেতে কীটনাশক ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।
- মাছের চলাফেরার মাধ্যমে ক্ষেতের কাদামাটি উলটপালট হয়। ফলে জমি হতে ধানের পক্ষে অধিকতর পুষ্টি গ্রহণযোগ্য হয়
- মাছের বিষ্টা সার হিসাবে ধান ক্ষেতের উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে।

ধান ক্ষেতে চাষ পদ্ধতি

সাধারণ দুই পদ্ধতিতে ধান ক্ষেতে মাছ চাষ করা যায়:

১. ধানের সাথে মাছের চাষ

- একই জমিতে ধান ও মাছ একত্রে চাষ করা হয়।
- আমন মৌসুমে মাঝারি উঁচু জমিতে যেখানে ৪-৬ মাস বৃষ্টির পানি জমে থাকে সেখানে ধানের সাথে মাছ চাষ করা যায়।
- বোরো মৌসুমে সেচ সুবিধার আওতাধীন জমিতে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়।

২. ধানের পরে মাছের চাষ

- বাংলাদেশের যে সমস্ত জমি বর্ষাকালে প্লাবিত হয় এবং রোপা আমন চাষ করা হয় না সেখানে এ পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা যায়।

মাছ চাষের জন্য জমি নির্বাচন

সব ধান ক্ষেত মাছ চাষের জন্য উপযোগী নয়। ধান ক্ষেতে মাছ চাষের সফলতা নির্ভর করে জমি নির্বাচনের উপর। জমি নির্বাচনের সময় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের দিকে লক্ষ রাখতে হবে। জমি নির্বাচনের সময় বিবেচনাধীন বিষয়সমূহঃ

- সাধারণত দো-আঁশ, বেলে দো-আঁশ এবং এঁটেল মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা এবং উর্বরাশক্তি বেশি বিধায় এসব মাটির জমি ধান ক্ষেতে মাছ চাষের জন্য উপযোগী।
- অতি উঁচু অর্থাৎ পানি ধরে রাখতে পারে না এবং অধিক নিচু জমি অর্থাৎ সহজেই প্লাবিত হয় সে সব জমি মাছ চাষের অনুপযোগী।
- বন্যার পানি প্রবেশ করে না এরূপ উঁচু জমিই মাছ চাষের উপযোগী।
- বোরো মৌসুমে চাষের ক্ষেত্রে সেচের সুবন্দোবস্ত থাকতে হবে।

ধান ক্ষেত প্রস্তুতকরণ

- যথাযথভাবে চাষ ও মই দিয়ে ধান চাষের প্রচলিত নিয়মে জমি প্রস্তুত করতে হবে।
- ক্ষেতের চারপাশের আইল কমপক্ষে ১ ফুট উঁচু ও ১ ফুট চওড়া করে তৈরি করতে হবে। তবে আইলের উচ্চতা নির্ভর করবে জমির অবস্থানের উপর।
- জমির যে অংশ অপেক্ষাকৃত ঢালু সে অংশে জমির শতকরা ২-৫ ভাগ এলাকা জুড়ে কমপক্ষে ২-৩ ফুট গভীর একটি ডোবা বা মিনি পুকুর খনন করতে হবে, যা ক্ষেতের কোনায়, পাশে বা মধ্যে হতে পারে।
- শুষ্ক বা খরা মৌসুমে অথবা অন্য কোনো কারণে জমির পানি শুকিয়ে গেলে উক্ত গর্ত মাছের জন্য সাময়িক আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে।
- জমি তৈরির জন্য প্রচলিত নিয়মেই জমিতে সার, গোবর ইত্যাদি প্রয়োগ করে ধান রোপণ করতে হবে।

ধানের জাত নির্বাচন

ধানের জাত নির্বাচনে যেসব বিষয় লক্ষ রাখতে হবে

- সমন্বিত ধান-মাছ চাষের ক্ষেত্রে যে জাতের ধান বেশি পানি সহ্য করার ক্ষমতা রাখে এবং ফলনও বেশি সেই জাত নির্বাচন করতে হবে।
- আমন মৌসুমের জন্য বিআর-৩ (বিপ্লব), বিআর-১১ (মুক্তা), বিআর-১৪ (গাজী) এবং বোরো মৌসুমের জন্য বিআর-১৪, বিআর-১৬, বিআর ২৮ ও ২৯ ইত্যাদি উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান উপযোগী।
- ধানের সাথে মাছ চাষের জন্য ধানের চারা অবশ্যই সারিবদ্ধভাবে রোপণ করতে হবে। সে ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০-২৫ সে.মি. এবং গোছা থেকে গোছার দূরত্ব ১৫-২০ সে.মি. রাখাতে হবে।
- যদি কোনো সময় বাইরে থেকে পানি সরবরাহের প্রয়োজন হয়, তখন পুকুর বা ভূগর্ভস্থ পানি সরবরাহ করতে হবে।
- ইঁদুর, কাঁকড়া ও অন্যান্য প্রাণী যাতে আইলে গর্ত না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি জমে ক্ষেত প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে অপেক্ষাকৃত ঢালু অংশে আইলের কিছু জায়গা ভেঙে বাঁশের বানা বা ছাঁকনিযুক্ত পাইপ দিয়ে অতিরিক্ত পানি বের করে দিতে হবে।

- ধান ক্ষেতে প্রাকৃতিভাবে উৎপাদিত খাবারই মাছের বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট। তবে প্রাকৃতিক খাবারের অপর্যাপ্ততা পরিলক্ষিত হলে প্রয়োজনবোধে মাছের খাবার হিসেবে ক্ষুদিপানা বা চালের কুঁড়া সরবরাহ করা যেতে পারে।
- প্রচলিত নিয়মে জৈব বা অজৈব সার প্রয়োগ করতে হবে।
- সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM) পদ্ধতিতে পোকা-মাকড় দমন করা যেতে পারে।
- ধান ক্ষেতের মাছকে ডোবা বা নালায় স্থানান্তরের পর প্রয়োজনীয় মাত্রায় কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে
- কীটনাশক ব্যবহারের পর বৃষ্টি হলে ৫-৭ দিন পর মাছগুলোকে ক্ষেতে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। আর যদি বৃষ্টি না হয় সে ক্ষেত্রে ৫-৭ দিন পর সেচের মাধ্যমে পুনরায় মাছকে সমস্ত জমিতে চলাচলের সুযোগ করে দিতে হবে।
- কীটনাশক ব্যবহারের উপযুক্ত সময় হলো বিকেল বেলা, কারণ এ সময় ধানের পাতা শুষ্ক থাকে।
- পাশের ক্ষেতে কীটনাশক ছিটানো হলে লক্ষ রাখতে হবে যেন কীটনাশক মিশ্রিত পানি কোনোক্রমেই মাছের ক্ষেতে প্রবেশ না করে।
- ধান রক্ষার জন্য জমিতে কীটনাশক প্রয়োগের প্রয়োজন হলে মাছকে আইলের সাহায্যে গর্তে আটকে রাখতে হবে।
- অতিরিক্ত গরম বা খরার সময় ক্ষেতে গর্তের পানি ঠাণ্ডা রাখার জন্য গর্তের কিছু অংশে কচুরিপানা রাখতে হবে।
- ক্ষেতের পানির প্রয়োজনের তুলনায় কমে গেলে দ্রুত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

ধান ক্ষেতে মাছ আহরণ

- ধান পাকার পর ক্ষেতের পানি কমিয়ে ধান কাটার ব্যবস্থা নিতে হবে, এ সময় মাছ আস্তে আস্তে ডোবায় চলে যাবে এবং মাছ ধরতে হবে।
- ধান ক্ষেতে সমন্বিত পদ্ধতিতে মাছ চাষ করলে ৩-৪ মাসে হেক্টরপ্রতি ৩২৫-৩৫০ কেজি মাছ এবং ৩০-৩.৫ টন ধানের ফলন পাওয়া যায়।
- অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, ধানের সাথে মাছ চাষ করলে ধানের ফলন গড়ে প্রায় শতকরা ১২-১৫ ভাগ বেশি হয়। এতে চাষিরা অধিক মুনাফা অর্জন করে থাকে।

পরামর্শ

- ধান ক্ষেতে কীটনাশক ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে।
- অতিবৃষ্টিতে যেন ধান ক্ষেত প্লাবিত না হয় অথবা খরায় ধান ক্ষেত শুকিয়ে না যায় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- চাষিকে দৈনিক সকাল ও বিকাল ধান ক্ষেত পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

পেনে মাছ চাষ

কোনো উন্মুক্ত বা আবদ্ধ জলাশয়ে এক বা একাধিক দিক বাঁশের বানা, বেড়া, জাল বা অন্য কোনো উপকরণ দিয়ে ঘিরে উক্ত জলাশয়ে মাছ মজুদ করে চাষ করাকে পেনে মাছ চাষ বলে। দেশে মৎস্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে না এমন বৃহদাকৃতির জলাশয়, সেচ খাল কিংবা রাস্তার পার্শ্বস্থ খাল ইত্যাদিতে পেন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। পেন পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের খাল, মরা নদী, হাওর, বাঁওড়, বন্যা প্লাবিত জলাভূমিতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে মাছের উৎপাদন বাড়ানোসহ বেকরাত্ব দূর করা সম্ভব। পেনে মাছ চাষের বৈশিষ্ট্য হলো পেনের বেড়া/জাল জলাশয়ের মাটিতে প্রোথিত থাকে এবং পেনের পানির সাথে বাইরের পানির সংযোগ বা প্রবাহ বিদ্যমান থাকে।

স্থান নির্বাচন

পেনে লাভজনকভাবে মাছ চাষের জন্য স্থান নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেসব বৃহৎ জলাশয় সাধারণভাবে চাষের আওতায় আনা সম্ভব নয় সেসব জলাশয় পেনে মাছ চাষের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে। তবে যে সমস্ত জলাশয়ের তলদেশ অত্যন্ত অসমান, বালি বা পাথর দ্বারা আবৃত, প্রবল স্রোত বিদ্যমান, পানি দূষণসহ ঝড়ো হাওয়ায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে ও নৌযান চলাচল করে সে সকল স্থান বাদ দিয়ে উন্মুক্ত জলাশয়ের যে কোনো স্থানে পেন তৈরি করা যেতে পারে। প্রয়োজনবোধে অল্প সময়ে পেন এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তর ও তৈরি করা যায়। বছরে অন্তত ৬-৮ মাস পানি থাকে এমন মৌসুমি জলাশয় যেমন-সেচ প্রকল্পের খাল, সংযোগ খাল, মরা নদ-নদী এবং নদ-নদীর খাড়ি অঞ্চল পেনে মাছ চাষের জন্য উপযুক্ত। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের লোনাপানিতে বৃহৎ ঘেরের জমির মালিকানা অনুযায়ী পেন তৈরি করে নিবিড়ভাবে চিংড়ি চাষ করা সম্ভব। কাপ্তাই হ্রদ, এমনকি দেশের সমুদ্র উপকূলের অগভীর অঞ্চলেও পেন তৈরি করে মাছ চাষ করার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

পেন নির্মাণ

বাঁশ, গাছের ডাল, নানা উপকরণ দিয়ে তৈরি বেড়া কিংবা জাল দিয়ে পেন তৈরি করা যায়। সাধারণত জলাশয়ের প্রস্থ কম হলে খালের এক পাশ থেকে আরেক পাশ পর্যন্ত আড়াআড়িভাবে খুঁটি পুঁতে বেড়া দিয়ে পেন তৈরি করা যায়। জাল দিয়ে বেড়া দেওয়ার সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন জালের ফাঁস ১০ মি.মি. এর চেয়ে বেশি না হয়। পেন তৈরির সময় টায়ার কর্ড জাল বা নটলেস পলিথিন জালও ব্যবহার করা প্রয়োজন। জলাশয়ের ধরনের উপর পেনের আকার নির্ভর করে। জলাশয়ের মালিকানা, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে ১.০ হতে ১০.০ হেক্টর আয়তনের যে কোনো আকৃতির জলাশয়ে পেন নির্মাণ করা যেতে পারে। পেনের আয়তন বড় হলে কখনো ব্যবস্থাপনার অসুবিধা দেখা দেয়। ছোট আয়তনের পেন ব্যবস্থাপনার জন্য সুবিধাজনক। যে এলাকায় পানিপ্রবাহ বেশি সেসব এলাকায় বাঁশ দ্বারা উঁচু বানা তৈরি করে তলদেশের মাটির মধ্যে বেশি করে বানা পুঁতে দিতে হবে। মহাল, বন বাঁশের বেড়া বা বানা ও বরাক বাঁশের খুঁটি সাধারণত ১-২ বছর টিকে। গিঁটবিহীন জাল ৪-৫ বছর ব্যবহার করা যায় আবার টায়ার্ড কর্ড জালের আয়ুষ্কাল ২-৩ বছর।

বানা তৈরির জন্য ব্যবহৃত নারিকেল কয়ের ও সিনথেটিক রশি ১-২ বছর টিকে থাকে। এছাড়া বেড়া বাঁধার জন্য ব্যবহৃত জিআই তারের আয়ুষ্কাল ১-২ বছর।

মাছ চাষ পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা

রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ এবং আগাছা দমন

পেন তৈরির পর জাল টেনে জলাশয় হতে যতদূর সম্ভব রাক্ষুসে মাছ বোয়াল, আইড়, শোল, গজার, টাকি, চিতল, ফলি ইত্যাদি) এবং অবাঞ্ছিত মাছ বেলে, পুঁটি, দারকিনা, মলা, চাপিলা, চাঁন্দা ইত্যাদি) ও আগাছা (কচুরীপানা, টোপাপানা, কলমীলতা, হেলেঞ্চা ইত্যাদি) দমন করতে হবে।

প্রজাতি নির্বাচনঃ পেনে চাষের জন্য প্রজাতির নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন প্রজাতির এমন সব মাছ ছাড়তে হবে যারা পানির সকল স্তরে খাবার খায়, যাদের খাদ্য শিকল সংক্ষিপ্ত, যাদের পোনা সহজে সংগ্রহ করা যায় এবং অল্প সময়ে চাষ করে বাজারে বিক্রির উপযোগী হয়। এসব দিকে বিবেচনা করে রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প, বিগহেড কার্প, গ্রাস কার্প, রাজপুঁটি, তেলাপিয়া, পাঙাশ প্রজাতির মাছ পেনে চাষ করার জন্য অত্যন্ত উপযোগী। তাছাড়া পেনে গলদা চিংড়ি চাষ করাও সম্ভব।

চিত্রঃ পেনে মাছ চাষ

পোনা মজুদের হারঃ অধিক ফলনের জন্য সুস্থ ও সবল পোনা নির্দিষ্ট হারে মজুদ করা প্রয়োজন। পোনা মজুদের সময় পোনার আকার যেন কোনো ক্রমেই ১০ সে.মি. এর কম না হয়। কারণ ছোট পোনা পেনের বেড়া বা জালের ফাঁস দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়াও পেন থেকে অবাঞ্ছিত ও রাক্ষুসে মাছ সম্পূর্ণরূপে সরিয়ে ফেলা সম্ভব হয় না। তাই ১০ সে.মি. চেয়ে ছোট পোনা খেয়ে ফেলার আশঙ্কা থাকে।

পেনে হেক্টরপ্রতি ১৫ হাজার, কমপক্ষে ১০ সে.মি. আকার রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার/বিগহেড কার্প, গ্রাস কার্প, রাজপুঁটি, তেলাপিয়া, পাঙাশ মাছ যথাক্রমে ৩০:৫:২০:২৫:২০ অনুপাতে মজুদ করা যেতে পারে। পেনে গিফট জাতীয় তেলাপিয়া এবং পাঙাশ মাছের একক চাষও করা যেতে পারে।

পেনে খাদ্য সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনাঃ মজুদকৃত মাছের মোট ওজনের ২.৩% হারে সহজলভ্য খাদ্য যথা- খৈল, কুঁড়া, ভুসি, আটা, চিটাগুড় ইত্যাদি প্রয়োগ করতে হবে। সম্পূরক খাদ্যের অনুপাত যথাক্রমে খৈল ৩৫%, কুঁড়া ৩০%, ভুসি ৩০%, আটা ৩%, চিটাগুড় ২% হলে ভালো হয়।

মাছের কোনো প্রকার রোগ বা দৈহিক বৃদ্ধির সমস্যা দেখা দিলে তা প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রতি মাসে একবার মাছের নমুনা সংগ্রহ করে মাছের বৃদ্ধি অনুযায়ী সম্পূরক খাদ্যের পরিমাণ সমন্বয় করে বর্ধিত হারে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়াও পেনের বেড়া বা জালে কোনোরূপ ক্ষতি হয়েছে কিনা সে বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে। অনেক সময় পেনের বেড়া ও জালে ময়লা, আবর্জনা জমে পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হলে বেড়া ও জাল পরিষ্কার করা না হলে পানির চাপে জাল ছিঁড়ে যেতে পারে ও বেড়া ভেঙে যেতে পারে। মাছ সংরক্ষণ, সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ ও পেন পরিচর্যার জন্য সার্বক্ষণিকভাবে পেন সংলগ্ন এলাকায় লোক পাহারা থাকা আবশ্যক। পেনে পোনা মজুদের ৬-৮ মাস পরই বিক্রিযোগ্য মাছ পাওয়া যায়। যেসব জলাশয়ে সারা বছর পানি থাকে সেসব জলাশয় হতে বাৎসরিক ভিত্তিতে মাছ আহরণ করা যেতে পারে।

পেনে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ

পেনে মাছ চাষ বৃহৎ জলাশয়ে হয়ে থাকে বিধায় মাছ চুরির আশঙ্কা থাকে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য পেনে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ অধিক ফলপ্রসূ। এতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণের অংশগ্রহণের ফলে ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু হয় এবং অধিক উৎপাদন পাওয়া যায়। গ্রামীণ বেকার যুবক/যুবতী, আনসার/ভিডিপি সদস্য, গরিব দুস্থ মহিলা, ভূমিহীন জনগণকে নিয়ে সংগঠনের মাধ্যমে একত্র করে পেনে মাছ চাষে অংশগ্রহণ করানো যায়। গ্রামের দরিদ্র মহিলারা অত্যন্ত উৎসাহ ও নিপুণতার সাথে পেন তৈরি, বাঁশের বানা ও বেড়া তৈরি, মাছ চাষ, খাবার তৈরি ও সরবরাহ, পাহারা দেওয়াসহ যাবতীয় কাজ করতে পারে। এভাবে গ্রামীণ মহিলাদেরকেও পেনে মাছ চাষে সম্পৃক্ত করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা যায়।

আহরণ ও উৎপাদন

উল্লিখিত পদ্ধতিতে পেনে মাছ চাষ করলে বছরে ৫-৬ টন/হে. মাছ উৎপাদন করা সম্ভব। জলাশয়ে পানির স্থায়িত্ব ও মাছের প্রজাতি অনুযায়ী বছরে ১-২ বার মাছ আহরণ করা যেতে পারে।

পরামর্শ

- অপরিকল্পিতভাবে পার্শ্ববর্তী কৃষিজমিতে কীটনাশকের প্রয়োগ পেনে মাছ চাষে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। তাই খাল বা সেচ এলাকায় অপরিকল্পিত কীটনাশকের ব্যবহার রোধ করতে হবে।
- পেনে চাষকৃত মাছের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষাসহ বানা, জাল ইত্যাদির অবস্থা সম্পর্কে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ক্ষতিকর জলজ প্রাণী যেমন- কাঁকড়া পেনের জাল যাতে কেটে ফেলতে না পারে সেজন্য চাষের আগেই খালের কাঁকড়া অপসারণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

সপ্তম অধ্যায়
গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন

গরু পালন

চিত্র : গরু

দেশের মানুষের প্রাণিজ আমিষের (মাংস, দুধ) এক বিরাট অংশ গবাদিপশু বিশেষ করে গরুর মাধ্যমে মিটানো হয়ে থাকে। সফলভাবে দুধ অথবা মাংসের জন্য গরু পালন করলে একজন খামারির প্রধান বিবেচ্য বিষয়সমূহ হলো: ১. ভালো জাত নির্বাচন, ২. ভালো বাসস্থান, ৩. কৃমিমুক্তকরণ, ৪. সুষম খাদ্য, ৫. পরিষ্কার পানি ও অন্যান্য পরিচর্যা, ৬. খামারের জীব নিরাপত্তা বিধান রাখা, ৭. গরুর প্রজনন ব্যবস্থাপনা, ৮. মানসম্পন্ন পথ্য, ফিড এডিটিভস প্রদান; ৯. ভ্যাকসিন/টিকা প্রদান।

গরু বাজারজাতকরণ ও সুফল লাভ

উপযুক্ত পরিচর্যা ও পুষ্টিসমৃদ্ধ সম্পূরক খাদ্যের জোগান পেলে ৩ মাসেই ৪০ থেকে ৬০ কেজি মাংস বৃদ্ধি সম্ভব। এতে একজন খামারি ১টি গরু পালন করে একবারে ৫-১০ হাজার টাকা মুনাফা অর্জন করতে পারে। এ প্রযুক্তিটি দেশের দারিদ্র্য বিমোচন, আমিষজাতীয় পুষ্টি সরবরাহ, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সর্বোপরি দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

১. ভালো জাত নির্বাচন -গরু নির্বাচন: ২-৩ বছরের গরু নির্বাচন করা। গায়ের চামড়া ঢিলা, শরীরের হাড়গুলো আনুপাতিক হারে মোটা; মাথা ও ঘাড় চওড়া এবং খাটো; পাগুলো খাটো যা শরীরের সাথে যুক্ত ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে।

সূত্র	খাদ্য	খাদ্যে ওজনের ভিত্তিতে গঠন
ইউএমএস	খড়ঃ চিটাগুড়ঃ ইউরিয়া	১০০:২২-৩০:৩
সংরক্ষিত	খড়ঃ ইউরিয়া	১০০:২.০
তাজা ও ভেজা খড়	খড়ঃ চিটাগুড়	১০০০:৩-৫
সবুজ ঘাস	সবুজ ঘাসঃ ইউরিয়া	১০০:৩-৩.৫

২. ভালো বাসস্থান ও কৃমিমুক্তকরণ: গরু সংগ্রহের পর পালের সকল গরুকে একসাথে কৃমিমুক্ত করতে হবে।

৩. সুষম খাদ্য -পুষ্টি ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা: মোটাতাজাকরণের মোট খরচের ৭০-৮০ শতাংশই খাদ্য খরচ। গরু মোটাতাজাকরণে ২ ধরনের খাদ্যের সমন্বয়ে রসদ তৈরি করা হয় যেমন- আঁশজাতীয় ও দানাদারজাতীয় খাবার । আঁশজাতীয় খাবারের মধ্যে খড়, হে, রাফেজ, সাইলেজ, লতাপাতা এবং দানাদার খাবারের মধ্যে ভুট্টা, চাল, গম, খেসারী ভাঙা, বিভিন্ন শস্যের উপজাত, খৈল, ভুসি, খনিজ লবণ ইত্যাদি। গরুকে ঘাস ও দানাদার খাবার সরবরাহে ২/৩ আঁশ এবং ১/৩ ভাগ দানাজাতীয় খাবার দিয়ে তার শারীরিক চাহিদা মেটানো হয়ে থাকে।

চিত্র : গরু মোটাতাজাকরণ

সরবরাহকৃত আঁশজাতীয় খাদ্য প্রস্তুতের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো-

সবুজ ঘাসভিত্তিক খাদ্য প্রদান তালিকা

- সবুজ ঘাস+দানাদার মিশ্রণ (দৈহিক ওজনের ০-১%)
- সবুজ ঘাস+মোট ঘাসের ২.৫-৩% চিটাগুড়+দানাদার মিশ্রণ (দৈহিক ওজনের ০.৮-১.০%)
- সবুজ ঘাস, ইউএমএস, দানদার মিশ্রণ (দৈহিক ওজনের .৮-১.০%) ।

আমাদের দেশে বছরে ৬ লক্ষ মে. টন গরুর মাংস উৎপাদন হয়। গরু মোটাতাজাকরণে ষাঁড় ও বলদ অথবা পুনঃউৎপাদন ক্ষমতাহীন গাভিগুলোকেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ প্রযুক্তিটির মেয়াদ ৩-৪ মাস পর্যন্ত হয়ে থাকে।

মহিষ পালন

দেশের কৃষিকাজের জন্য সিংহভাগ শক্তির উৎস হলো গরু এবং মহিষ। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে মহিষ পালনে তথা মহিষ উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করে এ দেশের প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণ, পারিবারিক আয় বৃদ্ধি, বেকার যুবসমাজের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। মহিষ বিশ্বে ২য় বৃহত্তম দুধ উৎপাদনকারী প্রাণী হিসেবে পরিচিত। মহিষের দুধে চর্বি বেশি কিন্তু কলস্টেরলের পরিমাণ কম। এছাড়া মহিষ প্রতিকূল আবহাওয়ায়ও টিকে থাকতে পারে। নিম্নমানের আঁশজাতীয় খাবার খেয়েও শরীর রক্ষার কাজ এবং দুধ উৎপাদন করতে সক্ষম।

মহিষের জাত: আবাস ও উপযোগিতার উপর ভিত্তিতে মহিষকে দুইভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে ১. জলাভূমির মহিষ ২. নদীর মহিষ। জলামহিষ এর গায়ের রং ধূসর, গাঢ় ধূসর হতে কালো রং এর হয়ে থাকে। জলামহিষ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নদীর মহিষ গাঢ় কালো, দেহ ত্রিভুজাকার। এ জাতের মহিষ প্রধানত দুধ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মুররা, নিলি, রাভি, জাফরাবাদি ইত্যাদি কয়েকটি উন্নত জাতের মহিষ রয়েছে।

মহিষের বাসস্থানঃ এর বাসস্থান ক) উদাম ঘর খ) বাঁধা ঘর হয়ে থাকে

মহিষের খাদ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনাঃ দুইধরনের খাদ্য যেমন- আঁশযুক্ত ও দানাদার খাদ্য এর খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। সবল ও কর্মক্ষম জীবনযাপন করার জন্য মহিষে যে খাদ্য রসদ তা হলো ১. স্বাস্থ্য পালন রসদ ২. উৎপাদন রসদ ৩. গর্ভধারণ রসদ ৪. সুষম রসদ।

চিত্র : মহিষ পালন

মহিষের বয়স ভেদে মেঝের আয়তন এবং খাবার পাত্রের আয়তন

প্রাণীর ধরন	মেঝের আয়তন (বর্গফুট)		খাবার পাত্রের আয়তন (ঘনফুট)
	মুক্ত এরিয়া	আবদ্ধ এরিয়া	
বয়স্ক মহিষ	২৫-৩০	৮০-১০০	২৪-৩০
বাড়ন্ত মহিষ	১৫-২০	৫০-৬০	১৫-২০
গর্ভবতী	১০০-১২০	১৮০-২০০০	২৪-৩০
ষাঁড়	১২০-১৪০	২০০-২৫০	২৪-৩০

ছাগল পালন

ছাগল পালন ভূমিহীন কৃষক, দুস্থ নারীদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে একটি অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশে বহুল পরিচিত এবং পালিত ২টি ছাগলের জাত হলো ব্ল্যাক বেঙ্গল এবং যমুনাপাড়ি। এছাড়া মাংস উৎপাদনে পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য ছাগলের জাত হলো সেনেন, বিটাল, বোয়ের ও বারবারি।

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল : বেঙ্গল গোট/ ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট জাতের ছাগল দৈনিক ২০০-৩০০ মিলি দুধ দেয়। সঠিক ব্যবস্থাপনায় দুধ উৎপাদন ১.০ লিটার পর্যন্ত হতে পারে। এর বাচ্চা উৎপাদন ক্ষমতা অধিক এবং দেশীয় আবহাওয়ায় অভ্যস্ত, এদের গড় ওজন ১৫-২০ কেজি, দৈহিক বৃদ্ধির হার ২০-৪০ গ্রাম/দিন। এ ছাগল কালোসহ সাদা-কালো-খয়েরি মিশ্র বর্ণের হয়ে থাকে।

চিত্রঃ ছাগল পালন

যমুনাপাড়ি ছাগল : যমুনাপাড়ি ছাগল দেশের সীমান্ত এলাকায় বেশি পাওয়া যায়। এদের শরীরের রং সাদা, কালো, হলুদ, বাদামি বা বিভিন্ন রং এর সংমিশ্রণে হয়ে থাকে।

এরা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু ও চঞ্চল। একটা বয়স্ক পাঁঠার ওজন ৬০-৯০ কেজি, ছাগির ওজন ৪০-৬০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। দৈনিক দুধ উৎপাদন ৩-৪ লিটার।

বাসস্থান : ছাগল ছেড়ে, অর্ধ ছেড়ে এবং আবদ্ধ অবস্থায় (স্টল ফিডিং) পালন করা যায়। আবদ্ধ অবস্থায় প্রতিটি বয়স্ক ছাগলের জন্য ঘরে জায়গা প্রয়োজন হবে ৭-১০ বর্গফুট। স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে প্রথমে ছাগলকে ৬-৮ ঘণ্টা মাঠে চরিয়ে বাকি সময় আবদ্ধ রেখে পর্যাপ্ত ঘাস ও দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা হয়। পরবর্তীতে চরানোর সময় ১-২ সপ্তাহের মধ্যে কমিয়ে ছাগলকে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়। ছাগল পালনে ২ ধরনের ঘর ব্যবহার করা হয় সেগুলো হলো- ১. ভূমির উপর ঘর ২. মাচার উপর ঘর।

খাদ্য : ছাগল সাধারণত তার ওজনের ৪-৫% হারে খেয়ে থাকে, এর মধ্যে ৬০-৮০% আঁশজাতীয় খাবার (ঘাস, লতা, পাতা, খড় ইত্যাদি) এবং ২০-৪০% দানাদার খাবার (কুঁড়া, ভুসি, চাল, ডাল)। বিভিন্ন বয়সের এবং উৎপাদনের উপর ছাগলের খাবার সরবরাহ করা হবে। সেগুলো হলো- বাচ্চা অবস্থায়, বাড়ন্ত, প্রজননক্ষম ছাগল ও পাঁঠা, গর্ভবতী ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা।

ভেড়া পালন

চিত্রঃ ভেড়া পালন

ভেড়া এদেশের অন্যতম গৃহপালিত প্রাণিজ সম্পদ। ভেড়া হতেও যথেষ্ট পরিমাণে মাংস, দুধ ও পশম পাওয়া সম্ভব। বর্তমানে বাংলাদেশের ভেড়ার সংখ্যা ৩২ লক্ষ।

বাংলাদেশি ভেড়ার জাত

বাংলাদেশে প্রাপ্ত ভেড়াসমূহ এখন পর্যন্ত জাত হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি না পেলেও এদের বিশেষ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কৃষি পরিবেশ অঞ্চল অনুসারে বাংলাদেশে তিন ধরনের ভেড়া দেখা যায়। যেমন- বরেন্দ্র এলাকার ভেড়া, যমুনা অববাহিকার ভেড়া; উপকূলীয় অঞ্চলের ভেড়া। এছাড়াও গারল জাতের ভেড়া বাংলাদেশের দক্ষিণাংশের সুন্দরবন অঞ্চলে পাওয়া যায়।

ভেড়া পালনের সুবিধা

- ভেড়া থেকে প্রধানত মাংস, পশম, চামড়া, জৈব সার পাওয়া যায়।
- একটি ভেড়া থেকে বছরে ৪টি পর্যন্ত বাচ্চা পাওয়া যায়।
- ভেড়া পরিবেশের সাথে সহজেই খাপ খাইয়ে চলতে পারে।
- ভেড়ার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি।

ভেড়ার বাসস্থান

ভেড়ার ঘর খড়, ছন, টিন বা ইটের তৈরি হতে পারে। এক্ষেত্রে মাচার উচ্চতা ২.৫-৩ ফুট এবং মাচা থেকে ছাদের উচ্চতা ৬-৮ ফুট হতে হবে। মাচার নিচে ঘরের মাঝ বরাবর উঁচু করে দুই পাশে ঢালু রাখতে হবে।

ভেড়ার খাদ্যাভ্যাস

ভেড়া মাটিতে চরে লতা গুল্মজাতীয় গাছের পাতা খায়। এদের খাদ্যে বাছ-বিচার সাধারণত কম। খুব সহজেই নতুন খাদ্যে অভ্যস্ত হয়। এরা ঘাস, লতাপাতা, সাইলেজ, হে, খড়, দানাদার খাদ্য ইত্যাদি খেয়ে থাকে।

ভেড়ার পশম উৎপাদন

ভেড়ার পশম কেটে সংগ্রহ করাকে পশম ছাঁটা বা শেয়ারিং বলে। আমাদের দেশে ভেড়াকে বসন্তকালে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) এবং শরৎকালে (অক্টোবর- নভেম্বর) ২ বার শেয়ারিং করানো হয়। বর্তমানে ভেড়ার পশমের সাথে পাট ও তুলা মিশিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাপড়, শাল, কম্বল ইত্যাদি তৈরি করা হচ্ছে।

ভেড়ার রোগসমূহ

ভেড়ার পরজীবীজনিত রোগ যেমন- চর্মরোগ, লোম উঠা ইত্যাদি দেখা যায়। তাছাড়া কিছু কিছু রোগ যেমন- ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, জ্বর মাঝে মাঝে দেখা যায়।

হাঁস পালন

চিত্র : হাঁস পালন

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে হাঁস পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। এ দেশের নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, পুকুর, ডোবা হাঁস পালনের উপযোগী। হাঁস প্রাকৃতিক খাদ্য খেয়ে তার খাদ্য চাহিদার অর্ধেকের বেশি পূরণ করে থাকে। যেহেতু দেশে প্রচুর খাল-বিল, নদী-নালা আছে তাই একজন খামারি সামান্য পরিমাণ খাদ্য প্রদান করে সারা বছরই গ্রামীণ পরিবেশে লাভজনকভাবে হাঁস পালন করতে পারে। বাংলাদেশের প্রধান হাঁসপ্রবণ এলাকাসমূহ হচ্ছে নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও এর আশপাশের নিচু এলাকাসমূহ। এ সমস্ত এলাকায় সচরাচর যে সমস্ত হাঁসের জাত দেখা যায় সেগুলো হলো- খাকি ক্যাম্বেল, দেশি, জেন্ডিং, ইন্ডিয়ান রানার ইত্যাদি। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে হাঁসের বাচ্চা সংগ্রহ করা যায় তার মধ্যে নারায়ণগঞ্জের কেন্দ্রীয় হাঁস প্রজনন খামার, খুলনার দৌলতপুর, নওগাঁ এবং নোয়াখালীর সোনাগাজীর আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামারেও হাঁসের বাচ্চা পাওয়া যায়। হাঁস আবদ্ধ, অর্ধ আবদ্ধ; ছেড়ে, হারডিং এবং ল্যানটিং পদ্ধতিতে পালন করা যায়।

হাঁসের ২টি মারাত্মক রোগ হলো- ডাক প্লেগ ও ডাক কলেরা। এ দুইটি রোগের ভ্যাকসিন সময়মতো ও পরিমাণমতো দিলে এর প্রকোপ হতে অনেকটা রক্ষা পাওয়া যায়। উন্নত ব্যবস্থাপনায় হাঁস পালন করলে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি, পুষ্টির অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনে অগ্রণী ভূমিকা পালনে সহায়ক হবে।

মুরগি পালন

দেশের প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণের ক্ষেত্রে মুরগি (ব্রয়লার, লেয়ার) পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। এর মাধ্যমে দেশের বেকার সমস্যার সমাধান, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি, সর্বোপরি দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উন্নত মুরগি পালনের মাধ্যমে অবদান রাখতে পারে।

চিত্র : লেয়ার স্টেইন

চিত্র : ব্রয়লার

ব্রয়লার : স্টারব্রো, ট্রপিকব্রো, ইসা বেডেট,

ইসা আই ৭৫৭, ইসা ৭৩০ এমপিকে হাবার্ড ক্ল্যাসিক, গোল্ডেন

কমেট, লোহম্যান, ব্রানকব, কাসিলা, কব ৫০৯ ।

লেয়ার স্টেইনের নাম: সোনালি, বেবার ৫৭৯, ইসা ব্রাউন, ইসা হোয়াইট, লোহম্যান ব্রাউন, লোহম্যান হোয়াইট, হাইসেক্স ব্রাউন, হাইসেক্স হোয়াইট।

একজন সফল ব্রয়লার/লেয়ার খামারি হওয়ার পূর্বশর্ত :

ক) গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য ও বাচ্চার প্রাপ্তিতার নিশ্চয়তা খ) গুণগত মানসম্পন্ন ভ্যাকসিন, পথ্য; ভিটামিন-প্রিমিক্স সরবরাহের নিশ্চয়তা গ) খামারে কঠোর জীব নিরাপত্তা বজায় রাখা ঘ) খামার ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছ ধারণা থাকা এবং ঙ) ফোরাম ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থা গড়ার মাধ্যমে সঠিক বাজারমূল্য নিশ্চিত করা।

২০১৯

পোল্ট্রি শিল্প

দেশের মুরগির মাংস এবং ডিমের চাহিদা সরবরাহের তুলনায় অপ্রতুল। এফএও এর হিসাব অনুযায়ী আমাদের দেশে মুরগির মাংসের মোট চাহিদা ১৭০০ মে.টন এবং ডিমের চাহিদা ২ কোটি। বাংলাদেশের মোট মুরগির মাংস এবং ডিমের চাহিদা বাণিজ্যিক মুরগি হতে প্রায় ৬০-৭০%। বাকি অংশ দেশি মুরগি হতে আসে। এ শিল্পের সাথে প্রত্যক্ষ ২০ লাখ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে যেখানে ৫০% নারী এ কাজের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ৫০ লাখ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এ শিল্পকে ঘিরে। বর্তমানে এ শিল্পে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। এ শিল্পের উন্নয়নে বিভিন্ন ব্যক্তি, উন্নয়ন কর্মী, এনজিওর পাশাপাশি সরকারিভাবে সার্বিক সহায়তা দিলে এগিয়ে যাবে। প্রয়োজন ভালো বাচ্চা ও খাবারের প্রাপ্তির নিশ্চয়তা, বাচ্চা ও খাদ্যের মূল্য সহনশীলতা, ওষুধ ও ভ্যাকসিনের প্রাপ্যতা ও গুণাগুণের নিশ্চয়তা, সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা। আগামী ২০২০ সাল নাগাদ এ খাতে বিনিয়োগ ৫০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

গবাদিপশুর রোগ পরিচিতি ও প্রতিকার

ক্ষুরারোগ

ক্ষুরারোগ বিভক্ত ক্ষুরবিশিষ্ট পশুর তীব্র ছোঁয়াচে ভাইরাস রোগ। জ্বর, মুখ ও পায়ে ফোসকা এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশে প্রতিবছর ক্ষুরারোগের কারণে বিপুল পরিমাণে আর্থিক ক্ষতি হয়।

লক্ষণ

প্রথমে জ্বর হয় এবং মুখ, পা ও বাঁটে রসভরা ফোসকার সৃষ্টি করে। খাদ্য গ্রহণের ফলে মুখের ভিতরে ও জিহ্বার ফোসকা ছিঁড়ে ক্ষত সৃষ্টি হয়। প্রদাহের ফলে মুখ থেকে প্রচুর লালা ঝরে, দুই পায়ের ক্ষুরের মাঝে ক্ষত সৃষ্টি হয়।

চিত্র : মুখ দিয়ে লালা ঝরছে

চিত্র : জিহ্বার ফোসকা

চিত্র : পায়ে ক্ষত

চিকিৎসা

মৃদু জীবাণুনাশক পদার্থ দ্বারা মুখ ও পায়ের ক্ষত পরিষ্কার করতে হবে। ক্ষুরারোগের জীবাণুর জটিলতা রোধে অ্যান্টিবায়োটিক অথবা সালফোনামাইড ইনজেকশন দিলে সুফল পাওয়া যায়। আক্রান্ত পশুকে শুকনো ও পরিষ্কার স্থানে রাখতে হবে এবং নরম খাবার দিতে হবে।

প্রতিরোধ

খামারের মানসম্মত জীবনিরাপত্তা ও প্রতি ৬ মাস পর পর এ রোগের টিকা প্রদান করতে হবে। রোগাক্রান্ত পশুকে সুস্থ পশু থেকে আলাদা করতে হবে । মৃত পশুকে গভীর গর্ত করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

পিপিআর রোগ

রোগটি আমাদের দেশে ছাগলে মাঝে মাঝে মহামারী আকারে দেখা দেয়। পিপিআর ভাইরাস দ্বারা এ রোগটি হয়।

লক্ষণ

ঝিম ধরে পিঠ বাঁকা করে দাঁড়িয়ে থাকে পরবর্তী পর্যায়ে নাক, মুখ ও চোখ দিয়ে তরল নিঃসৃত হয়। শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় (১০৬-১০৭° ফাঃ), পাতলা পায়খানা শুরু হয়। মলের রং গাঢ় বাদামি, মাঝে মধ্যে রক্তমিশ্রিত আম থাকতে পারে। আক্রান্ত ছাগলের ব্যাপকভাবে নিউমোনিয়া দেখা দেয়, নাকের পথ বন্ধ হয়ে যেতে পারে ও শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে ৭-৯ দিনের মাথায় আক্রান্ত প্রাণী মারা যেতে পারে।

চিত্র : মুখ দিয়ে তরল নিঃসৃত

চিকিৎসা

এ রোগের সুনির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই, তবে লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা করালে মৃত্যুর হার কমানো যায়। পানিশূন্যতা রোধের জন্য ছাগলকে মুখে বা শিরায় পর্যাপ্ত স্যালাইন দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

প্রতিরোধ

রোগ দেখা দেওয়ার আগেই সুস্থ ছাগলকে পিপিআর টিকা দিতে হবে। একবার টিকা প্রয়োগ করলে সাধারণত এক বছরের অধিক সময় প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে। টিকাকৃত ছাগীর বাচ্চায় তিন মাস পর্যন্ত পিপিআর রোগের অ্যান্টিবডি থাকে। এ রোগে আক্রান্ত মৃত ছাগলকে পুড়িয়ে অথবা নিরাপদ দূরত্বে পুঁতে ফেলতে হবে।

তড়কা রোগ বা অ্যানথ্রাক্স

তড়কা ব্যাকটেরিয়া সৃষ্ট পশুর একটি মারাত্মক রোগ। রোগটি পশু থেকে মানুষে ছড়াতে পারে।

লক্ষণ

অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষণ প্রকাশের আগে মারা যায়, কখনো কখনো ১-২ ঘণ্টা স্থায়ী হয়, জ্বর (১০৪-১০৭ ফা), ক্ষুধামান্দ্য, নিস্তেজতা, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস, পেট ফাঁপা, গর্ভপাত, দেহের কাঁপুনি, রুমেনের গতি কমে যায়, নাক, মুখ, প্রস্রাব ও মলদ্বার দিয়ে রক্তক্ষরণ হতে দেখা যায় ও শরীরের ভিতরে বিভিন্ন অঙ্গে রক্তক্ষরণ হয়।

চিত্র : মলদ্বার দিয়ে রক্তক্ষরণ

চিত্র : নাক দিয়ে রক্তক্ষরণ

চিত্র : হাতে ক্ষত

চিকিৎসা

তড়কা রোগের চিকিৎসায় অ্যান্টিসিরাম ও অ্যান্টিবায়োটিক ভালো কাজ করে। অ্যান্টিসিরাম পাওয়া গেলে ১০০-২৫০ মিলি হিসেবে প্রতিটি আক্রান্ত গরুতে প্রত্যহ শিরায় ইনজেকশন দিতে হবে। তবে একই সময়ে অ্যান্টিসিরাম ও অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন অধিক কার্যকর। পেনিসিলিনজাতীয় ওষুধ প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১০,০০০ ইউনিট করে মাংসপেশিতে দিনে দুইবার করে ৫ দিন ইনজেকশন দিতে হয়।

প্রতিরোধ

রোগাক্রান্ত পশুকে সুস্থ পশু থেকে পৃথক রেখে চিকিৎসা ও সুস্থ পশুকে টিকা প্রদান করতে হবে। মড়কের সময় পশুর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। শুষ্ক ও পরিচ্ছন্ন অবস্থায় পালন করতে হবে। এ রোগ প্রতিরোধে ১ মিলি চামড়ার নিচে ইনজেকশন দিতে হবে এবং প্রতিবছর একবার করে প্রয়োগ করতে হবে।

চিত্র : আক্রান্ত মাংসপেশি

বাদলা রোগ

এ রোগে পা আক্রান্ত হয় তাই একে ব্ল্যাক লেগ বলে। এ রোগ প্রধানত বাড়ন্ত বয়সের পশুর একটি তীব্র সংক্রামক রোগ।

লক্ষণ

অতি তীব্র প্রকৃতির রোগে আক্রান্ত পশু হঠাৎ মারা যায়। মৃত্যু আকস্মিক না হলে ক্ষুধামান্দ্য, জ্বর (১০৪-১০৭° ফাঃ), পেটে গ্যাস, নাকে শ্লেষ্মা, অবসাদভাব প্রকাশ পায়। উপসর্গ প্রকাশের ১২-৩৬ ঘণ্টার মধ্যে পশু মারা যায়।

পায়ের মাংসপেশি আক্রান্ত হয়, ফলে পশু হাঁটতে পারে না এবং খুঁড়িয়ে হাটে। আক্রান্ত মাংসপেশি কিছু ফোলা থাকে এবং টিপলে পচপচ শব্দ হয়।

চিকিৎসাঃ অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন দিয়ে চিকিৎসা করতে হয়।

প্রতিরোধ : বাদলা রোগের টিকা দিয়ে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

ওলান পাকা রোগ

গাভির ওলানের কোষ-কলায় রোগজীবাণু বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক দ্বারা প্রদাহের সৃষ্টি হলে তাকে ওলান পাকা রোগ বলে। এ রোগ বিশেষ করে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অস্বাস্থ্যকর উপায়ে ও অপরিষ্কার হাতে দুধ দোহন, ওলানের বাঁটে ক্ষত বা ঘা এ সমস্ত অব্যবস্থাপনার কারণে দেখা দিতে পারে।

চিত্র : শক্ত ওলান

২০১৬

লক্ষণ

দুধ পানির মতো সাদা বা হলদে অথবা জমা দুধ, ওলান গরম থাকে, জ্বর হতে পারে।

চিকিৎসা

অ্যান্টিবায়োটিক ও অ্যান্টিহিস্টামিন মাংসে ইনজেকশন এবং সাধারণ স্যালাইন শিরায় ইনজেকশন দিয়ে চিকিৎসা করলে সুফল পাওয়া যায়।

প্রতিরোধ

খামারে নতুন গাভির আগমন হলে সাথে সাথে তার ওলান পরীক্ষাসহ দুধ পরীক্ষা করে ব্যবস্থা নিতে হবে। মাসে অন্তত দুইবার খালি চোখে দুধ পরীক্ষা করতে হবে।

ইউরিয়া ও এর বিষক্রিয়া

খড়কে শতকরা ৪ ভাগ ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত করে খাওয়ানো হয়। তবে ইউরিয়া মিশ্রিত খাদ্যে শর্করাযুক্ত হলে পশু অধিক মাত্রায় ইউরিয়া সহ্য করতে পারে। এছাড়া ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক করে পশুকে মোটাতাজাকরণে খাওয়ানো হয়।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ

গরুকে ইউরিয়া খাওয়ানোর ২০ থেকে ৬০ মিনিটের মধ্যে উপসর্গ প্রকাশ পায়। পেটে ব্যথা, ফেনাযুক্ত লালা ঝরা, মাংসপেশির কম্পন, শ্বাসকষ্ট, পেট ফাঁপা উপসর্গ দেখা দেয়।

চিকিৎসা

অ্যাসিটিক এসিড ৫% অথবা ভিনেগার ০.৫ থেকে ১ লিটার ভেড়া ও ছাগলকে খাওয়াতে হবে। গরুর জন্য ২-৫ লিটার। চিকিৎসার পর পুনরায় উপসর্গ দেখা দিলে ২০ মিনিট পর পুনরায় ওষুধ খাওয়ানো যায়।

পেট ফাঁপা বা ব্লোট

গবাদিপশুর (রোমন্থনকারী পশু) পেটে (রুমেনে) অতিরিক্ত গ্যাস জমা হয়ে এ রোগের সৃষ্টি হয়। যদি কেবল অতিরিক্ত গ্যাস জমা হয় হবে তাকে টিপ্যানি বলে এবং গ্যাসের সাথে ফেনা থাকলে তাকে পেট ফাঁপা বা ব্লোট বলা হয়।

চিত্র : আক্রান্ত পশু

গবাদিপশুর পেটে প্রায় ৫০০-৬০০ লিটার গ্যাস উৎপাদিত হয়। এ গ্যাস বের হতে না পারলে বা বের হওয়ার পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে এ রোগ হতে পারে। নরম ডালজাতীয় (লিগিউম) ঘাস খাওয়ার ফলে ফেনাযুক্ত গ্যাস তৈরি হয়। এর কারণ রুমেনের অণুজীব দ্রুত এ ঘাস পরিপাকে সাহায্য করে কিন্তু এত অল্প সময়ে পশু গ্যাস বের করতে পারে না। আবার ফেনাযুক্ত হওয়ায় এ গ্যাস বের হতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। নরম সবুজ ঘাস, পশুর চারণভূমিতে অতিরিক্ত ইউরিয়া প্রয়োগ করা হলে পশুর এ রোগ হতে পারে।

২০১৮

লক্ষণ

পশুর পেট (রুমেন) অস্বাভাবিকভাবে ফুলে যায়। পশু অস্বস্তিতে থাকে বারবার মাটিতে বসে। পশুর শ্বাসকষ্ট হয়। জিভ বের হয়ে যায় এবং লালা পড়ে। আক্রান্ত পশু আস্তে আস্তে দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে যায়। খাওয়া ও পায়খানা-প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়।

চিকিৎসা

পশুর রোগ যদি গুরুতর হয় তবে দ্রুত পেটের বাম পাশের মাঝখানে ট্রকার ও ক্যানুলা প্রবেশ করিয়ে গ্যাস বের করে দিতে হবে।

প্রতিরোধঃ নরম সবুজ ঘাস বা ডালজাতীয় ঘাস শুকনা খড়ের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে।

কৃমি

কৃমি আক্রান্ত পশু মাঠে বা চারণভূমিতে পায়খানা করার ফলে মাঠের ঘাস দূষিত হয়। এসব দূষিত ঘাস সুস্থ গরু খেলে তারাও কৃমিতে আক্রান্ত হয়। তাছাড়া অনেক কৃমি আছে যা শরীরের চর্ম ভেদ করে দেহে প্রবেশ করে।

লক্ষণ

কৃমিতে আক্রান্ত গবাদিপশু সহজে মারা না গেলেও স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে এবং দৈহিক বৃদ্ধি হ্রাস পায়। ঠিকমতো খাবার দিলেও তার স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি হয় না। বরং দিন দিন রোগা হতে থাকে। পশু ক্রমান্বয়ে হাড্ডিসার হয়ে পড়ে ।

চিকিৎসা/প্রতিরোধ

কৃমির জন্য কৃমিনাশক ওষুধ প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। আমাদের দেশে গবাদিপশুর লালন-পালন ব্যবস্থায় বছরে ৩ বার কৃমির ওষুধ খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

চিত্র : ঝিমানো অবস্থায় মুরগি

কোনো গবাদিপশু অসুস্থ হলে তৎক্ষণাৎ সুস্থ প্রাণী থেকে আলাদা রাখতে হবে।

এজন্য দ্রুত নিকটস্থ পশু হাসপাতালে যোগাযোগ করতে হবে।

মুরগির রোগঃ রাণীক্ষেত

টিকা দেওয়া হয় নাই এ রকম মুরগির ঝাঁকে ১০০ ভাগ মুরগিই এ রোগে

আক্রান্ত হতে পারে এবং ১০-৯০ ভাগ মুরগি মারা যেতে পারে।

চিত্র : ঘাড় ও মাথা উঁচানো অবস্থায় মুরগি

লক্ষণ

ঝিমানো, সবুজ পাতলা পায়খানা, মুখ দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া, ঘড়ঘড় শব্দ করা ।

চিকিৎসা

আক্রান্ত খামারে টিকা দেওয়া থাকলে মৃত্যুর হার কম থাকে। এ ধরনের খামারে অ্যান্টিবায়োটিক পানিতে মিশিয়ে ৩-৫ দিন মুরগিকে খাওয়াতে হবে । মুরগির ধকল থেকে দ্রুত মুক্তি পাওয়ার জন্য ভিটামিনজাতীয় ওষুধে ভালো ফল পাওয়া যায়।

প্রতিরোধঃ খামারের টিকা দিয়ে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা বা এভিয়ান ফ্লু বা বার্ড ফ্লু

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা একটি উচ্চ সংক্রমণশীল ভাইরাসজনিত মুরগিজাতীয় পাখির রোগ এবং পূর্বে রোগটিকে 'ফাউল প্লেগ'ও বলা হতো। বাংলাদেশে ২০০৭ সালের মার্চ মাসে প্রথম এ রোগ শনাক্ত করা হয়।

লক্ষণ

ডিমপাড়া মুরগি সর্বপ্রথম নরম খোসাবিশিষ্ট ডিম পাড়ে, কিন্তু এরপর হঠাৎ ডিম পাড়া বন্ধ করে দেয়। ঝুঁটি এবং গলকম্বল নীলাভ রং ধারণ করে এবং অগ্রভাগে ছোট ছোট অথবা বড় ধরনের রক্তক্ষরণের চিহ্ন দেখা যায়। মাথা ফুলে যায় এবং পানি জমে থাকতে পারে। পালকবিহীন স্থানে রক্তক্ষরণ দৃশ্যমান হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে ৫০-১০০ ভাগ মৃত্যুহার দেখা যায়।

চিত্র : নরম খোসাবিশিষ্ট ডিম

চিত্র : পালকবিহীন স্থানে রক্তক্ষরণ

চিত্র : মৃত মুরগি

২০১৬

চিকিৎসা: এ রোগের কোনো ফলপ্রসূ চিকিৎসা নাই।

প্রতিরোধ

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ নিয়ন্ত্রণে যে সকল পদ্ধতি বিশ্বব্যাপী ব্যবহার হয়ে আসছে তা হলো- (১) দ্রুত রোগ শনাক্ত করা এবং দ্রুত আক্রান্ত মুরগি নির্মূল করা (২) আক্রান্ত খামার জীবাণুমুক্ত করা ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা (৩) ভ্যাকসিন প্রদান করা।

গামবোরো

গামবোরো ভাইরাসজনিত একটি ছোঁয়াচে রোগ। গামবোরো রোগ সাধারণত ৩-৬ সপ্তাহের মুরগির বাচ্চায় তীব্র আকারে দেখা দেয়।

লক্ষণ

মুরগির পালক উসকো-খুসকো থাকে। মুরগির মধ্যে ঝিমানো ভাব দেখা যায় এবং তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং কাঁপতে থাকে। মাংসের উপর রক্তের ছিটা দেখা যায়।

চিত্র : গামবোরো আক্রান্ত মুরগি

চিকিৎসা

সাধারণত ভাইরাসজনিত রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ ঠেকানোর জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়।

প্রতিকার: গামবোরো রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা ব্যবহার করতে হবে।

ডাক প্লেগ

ডাক প্লেগ ভাইরাসজনিত একটি ছোঁয়াচে রোগ। মৃত্যুহার ৮০-৯০ ভাগ।

চিত্র : ডাক প্লেগ আক্রান্ত হাঁস

লক্ষণ

হাঁসের চোখ দিয়ে পানি ঝরে। চাল ধোয়া পানির মতো ধোসা পায়খানা করে। মাঝে মাঝে নীলাভ, মাঝে মাঝে সবুজ পায়খানা করে। পা অবশ

হয়ে যায় এবং এক জায়গায় চুপচাপ বসে থাকবে, ঝিমাবে।

চিকিৎসা

দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ ঠেকানোর জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়।

প্রতিকার: ডাক প্লেগের ভ্যাকসিন দিতে হবে।

ডাক কলেরা

ডাক কলেরা ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ।

লক্ষণ : তরল পায়খানা হবে। ঘন ঘন পায়খানা হবে। মৃত্যুহার ৮০-৯০ ভাগ।

চিকিৎসা: অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

প্রতিকার: ডাক কলেরার ভ্যাকসিন দিতে হবে।

চিত্র : ডাক কলেরা আক্রান্ত হাঁস

অষ্টম অধ্যায়
শাকসবজি ও ফলের আধুনিক উৎপাদন ও রপ্তানি

ফলের বর্তমান অবস্থা হিসাবে বলা যায় ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী যথাক্রমে বাংলাদেশে প্রায় ৭.৭০ লক্ষ হেক্টর জমিতে প্রায় ১০০ রকমের সবজি এবং ৪.৬২ লক্ষ হেক্টর জমিতে আলু এবং ৬.৭৮ হেক্টর জমিতে প্রায় ৭০ ধরনের বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ১৩৯.১৯ লক্ষ টন, ৮৯.৫০ লক্ষ টন এবং ১০৬.৭২ মেট্রিক টন (সূত্রঃ কৃষি ডাইরি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ২০১৫)। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সবজির মধ্যে আলু, লাউ, মিষ্টিকুমড়া, শশা, ঝিঙ্গা, জালি কুমড়া, চিচিঙ্গা, করলা, পটোল, শিম, বরবটি, ঢেঁড়শ, টমেটো, বেগুন, কাঁচা মরিচ, পানিকচু, মুখী কচু, কচুর লতি এবং পাতাজাতীয় সবজি যেমন-লালশাক, ডাঁটাশাক, পালংশাক, কলমিশাক, পুঁইশাক উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে ফলের মধ্যে আম, জাম, কলা, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, আনারস, লেবুজাতীয় ফল, পেঁপে, নারিকেল ও কুল অন্যতম। মৌসুমি সবজি ও ফলের বৈশিষ্ট্যগত কারণে গ্রীষ্মকালীন উদ্যান ফসলের (সবজি ও ফল) স্থায়িত্বকাল তুলনামুলকভাবে খুবই কম এবং বিশেষভাবে উল্লেখিত ফলগুলোর সহজলভ্যতা খুবই স্বল্পকালীন। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালীন এবং বর্ষাকালীন ফলের পরবর্তী সময়ে দেশীয় ফলের সরবরাহ খুব একটা পরিলক্ষিত হয় না। একই সময়ে সবজির সহজলভ্যতাও অনেকাংশে হ্রাস পায়।

বাংলাদেশের উৎপাদিত পণ্য মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ যথা- সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, বাহরাইন, ওমান, কুয়েত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ যেমন- যুক্তরাজ্য, ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ড, সুইডেন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ তথাঃ মালয়েশিয়া, গণচীন, হংকং, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনাই দারুস সালাম, সিঙ্গাপুর-এ বিগত দিনগুলোতে এথনিক বাজারে রপ্তানি হয়ে আসছে। গ্রীষ্মকালে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে উচ্চ তাপমাত্রা এবং শীতকালে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে হিমাংকের নিম্নে তাপমাত্রা বিরাজমান থাকায় উল্লেখিত স্থানসমূহে স্থানীয়ভাবে তেমন একটা চাষাবাদের সুযোগ নেই বিধায় উল্লেখিত সময়ে বহির্বিশ্ব থেকে আমদানিকৃত শাকসবজি, ফল-মূল দ্বারা স্থানীয় চাহিদা পূরণ করা হয়। যা উল্লেখযোগ্য অংশ বাংলাদেশ হতে সরবরাহ করা হয়ে থাকে এবং এর পরিমাণ প্রায় ৯২,৬৭৯ মেট্রিক টন।

বর্তমানে বাংলাদেশ হতে শাকসবজি যথা- কাঁকরোল, বেগুন, পটোল, করলা, লাউ, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা, মিষ্টিকুমড়া, বরবটি, দেশি শিম, ঢেঁড়শ, পানিকচু, কচুর লতি, মুখী কচু, শশা, জালি কুমড়া, কাঁচা কলা, কাঁচা পেঁপে, আলু, লালশাক, পুঁইশাক, ডাঁটাশাক, কাঁচা মরিচ ইত্যাদি এবং ফল যেমন- কাঁঠাল, আম, জাম, লিচু, পেঁয়ারা, লটকন, বিভিন্ন প্রকারের লেবু (সাতকড়া, এলাচিলেবু, জারা লেবু, বাতাবিলেবু, তৈকর, বীজবিহীন লেবু), আনারস, বেল, কদবেল, কুল, জামরুল, আমড়া, কামরাঙ্গা, শরিফা, আতাফল, আমলকী, জলপাই, চালতা, তেঁতুল ইত্যাদি সীমিত পরিমাণে ইউরোপীয় দেশসমূহ যেমন- যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ তথাঃ সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত, বাহরাইন, ওমান, লেবানন প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয়ে আসছে। সারণি-১ এ ১৯৯৩-১৯৯৪ হতে ২০১৩-২০১৪ বাংলাদেশ ১০৫

হতে রপ্তানিকৃত শাকসবজি ও ফলের ৫ বছর অন্তর একটি পরিসংখ্যান নিম্নে প্রদত্ত হলো:

বর্ষ	পরিমাণ (মে. টন)	ক্রমবৃদ্ধি (%)	মূল্য (আমেরিকান ডলার) মিলিয়ন	ক্রমবৃদ্ধি (%)
১৯৯৩-১৯৯৪	৮৪২২	-	৯.৪৪	-
১৯৯৮-১৯৯৯	১৩১১৯	(+) ৫৫.৭৭	১৭.৭০	(+) ৮৭.৫০
২০০৩-২০০৪	১৬১৪৪	(+) ২৩.০৬	২৪.৭০	(+) ৩৯.৫৫
২০০৮-২০০৯	২৪,৬৭০	(+) ৫২.৮১	৫০.৭১	(+) ১০৫.৩০
২০১৩-২০১৪	৯২৬৭৯	(+) ২৭৫.৬৭	২১০.০০	(+) ৩১৪.১২

শাকসবজি ও ফলের বর্তমান রপ্তানি বাজার ব্যবস্থা

সাধারণত আমদানিকারকগণের চাহিদানুযায়ী বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে সরবরাহকারীগণের (Suppliers) মাধ্যমে রপ্তানিকারকগণ তাদের কাঙ্ক্ষিত পণ্য সংগ্রহ করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকগণ বাজার থেকে বাজারজাতকরণ নীতি (Market to Market approach) অনুসরণ করেন। তবে, রপ্তানিকারকগণের চাহিদানুযায়ী কখনো কখনো সবরবাহকারীগণ কৃষক/উৎপাদকের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে সরাসরি বাগান থেকে ফল সংগ্রহ করে থাকেন। এখানে উল্লেখ্য যে, সরবরাহকারীগণ জারালেবু এবং কাঁঠাল বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সরাসরি কৃষকের বাগান থেকে নিজেদের চাহিদা মোতাবেক সংগ্রহ করে রপ্তানিকারকগণকে সরবরাহ করে থাকেন। বাংলাদেশি রপ্তানিকারকগণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বহির্বিশ্বের সীমিত এশিয়ান অধ্যুষিত বাজারে (Ethnic Market) পণ্য রপ্তানি করেন বিধায় পণ্যের গুণগত মান রক্ষায় তেমন একটা আন্তরিক নন। রপ্তানিকারকগণ নিজস্ব তত্ত্বাবধানে পণ্যের বর্ণ, আকার এবং গঠন অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাসসহ বাছাই করে পুনঃ ব্যবহৃত (Re-used) এবং পুনঃ তৈরিকৃত (Re-cycle) অনুন্নত করোগেটেড ফাইবার বোর্ড কার্টনে করে বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহের উচ্চমূল্যের বাজারে (High Value Market) গুণগত মানসম্পন্ন বাংলাদেশি তাজা শাকসবজি ও ফলের অপার সম্ভাবনা বিদ্যমান। উক্ত বাজারে প্রবেশাধিকারে পণ্যের মানদণ্ড, গুণগত মান, উচ্চমূল্যের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকার এবং রপ্তানিযোগ্য শাকসবজি ও ফলের গুণগত মান রক্ষায় করণীয়:

এশিয়ান অধ্যুষিত বাজার (Ethnic market) এর পাশাপাশি উচ্চমূল্যের বাজারে বাংলাদেশি তাজা শাকসবজি, ফল-মূল রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিমাণ কয়েক গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। বর্তমান বিশ্বের স্বাস্থ্যসচেতন ক্রেতাসাধারণের চাহিদানুযায়ী উচ্চমূল্যের বাজারে প্রবেশাধিকারের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি উত্তম কৃষি চর্চা (Global GAP) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে পণ্যের গুণগত মান রক্ষায় উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি (Good Agriculture Practice) অবলম্বন করা অত্যাবশ্যকীয়। রাসায়নিক এবং জীবাণু সংক্রমণমুক্ত

গুণগত মানসম্মত পণ্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণে উৎপাদন এবং সংগ্রহোত্তর পর্যায়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা অতীব জরুরি। এর পাশাপাশি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (World Trade Organization) সেনিটারি এন্ড ফাইটো-সেনিটারি (SPS) এবং ট্রেড ব্যারিয়ার ইন ট্রেড (TBT) নীতিমালা যথাযথভাবে অনুশীলন করা অত্যাবশ্যক।

উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি (Good Agriculture Practice) অবলম্বনে করণীয়

(ক) উৎপাদন পর্যায়ে করণীয়সমূহ

উচ্চমূল্যের মূল বাজার (High Value Mainstream Market)-এ বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে গুণগত মানসম্পন্ন শাকসবজি ও ফল উৎপাদনের কোনো বিকল্প নাই। অধিকন্তু ক্রেতার সন্তুষ্টি সাধনে উৎপাদিত ফসলের উৎপাদন প্রক্রিয়া তথা: (ক) উৎপাদন এলাকা নির্বাচন, (খ) উপযুক্ত জমি নির্বাচন, (গ) জাতসহ বীজ, চারা নির্বাচন, (ঘ) জমি/মাটি ব্যবস্থাপনা, (ঙ) চারা রোপণ প্রক্রিয়া, (চ) রাসায়নিক ও জৈব সার প্রয়োগ মাত্রা, সময় নির্ধারণ, (ছ) ব্যবহৃত সেচ/পানি এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনাসহ নিরাপদ সংক্রান্ত তথ্যাবলি, (জ) রোগবালাই এবং পোকা-মাকড় দমন ব্যবস্থাপনায় প্রয়োগ প্রণালিসহ ব্যবহৃত কীটনাশক/বালাইনাশক-এর ধরন, প্রয়োগের অনুমোদিত মাত্রা ও প্রয়োগ প্রণালি, কীটনাশক/বালাইনাশক প্রয়োগের পরামর্শক এবং প্রয়োগকারী তথ্যাবলি, (ঝ) সংগ্রহকালীন সময় ও পদ্ধতি ব্যবস্থাপনা, (ঞ) সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ অতীব জরুরি। উৎপাদক/কৃষক পরিচিতসহ যাবতীয় তথ্যাবলি যথাযথকর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিরীক্ষা এবং নিরাপদ এবং গুণগত মান বিবেচনায় সনদ সাপেক্ষে আন্তর্জাতিক উচ্চমূল্যের মূল বাজারে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত হবে এবং ক্রেতাসাধারণ কর্তৃক সাদরে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

(খ) সংগ্রহোত্তর পর্যায়ে করণীয়সমূহ

স্বাভাবিক অর্থে ফসল সংগ্রহকালীন সময় থেকেই সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু হয়। পণ্যের গুণগত মান রক্ষায় সংগ্রহকালীন সময় এবং সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত হতে প্রাপ্ত সংগ্রহোত্তর পর্যায়ে তাজা এবং পচনশীল পণ্য তথা: শাকসবজি, ফল-মূল-এর একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ (২৫-৪০%) অবচয় হয়। অবচয় রোধ এবং সঠিক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদিত ফলের পরিমাণ অনেকাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব এবং এই বিরাট অবচয় রোধকল্পে সঠিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এনজিও এবং বেসরকারি সংস্থা হতে অপর্যাপ্ত উদ্যোগ গ্রহণ;

শাকসবজি ও ফলের উৎপাদন সমস্যাবলি

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশে শাকসবজি ও ফলের উৎপাদন প্রকৃত চাহিদার চেয়ে অনেক কম যদিও এর উৎপাদন এলাকা এবং পরিমাণ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলের উৎপাদন প্রক্রিয়া যথাযথ বিশ্লেষণ পূর্বক প্রধান প্রধান সমস্যা নিরূপণ করা হয়েছে। উল্লেখিত সমস্যাবলি যথাযথভাবে বিবেচনাকরত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে ফলের আশানুরূপ ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব। সমস্যাবলি নিম্নরূপ:

- উপকরণের অধিক মূল্য

- সঠিক প্রযুক্তির অভাব
- উন্নত জাতের অভাব
- আধুনিক/উন্নত উৎপাদন কলাকৌশল-এর অভাব
- উচ্চ মাত্রায় সংগ্রহোত্তর অবচয়
- রোগবালাইয়ের প্রাদুর্ভাব
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ
- উন্নত বাজার ব্যবস্থাপনার অভাব

শাকসবজি ও ফল রপ্তানির প্রধান সমস্যাবলি

আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য সরবরাহের জন্য ধারাবাহিকতা আবশ্যক। বাংলাদেশি শাকসবজি ও ফল প্রধানত নির্ধারিত মৌসুমি ফলে, যা সীমিত সময়ের পর আর সরবরাহ করা সম্ভবপর হয় না। এর ফলে আমদানিকারক সংস্থাকে বিকল্প উৎসের সন্ধান করতে হয়। ধারাবাহিক এবং দীর্ঘসময়ব্যাপী শাকসবজি ও ফল রপ্তানির লক্ষ্যে বর্ষব্যাপী রপ্তানিযোগ্য শাকসবজি ও ফলের জাত উদ্ভাবন করতে হবে। অন্যান্য সমস্যাবলির মধ্যে (১) অপর্যাপ্ত উৎপাদন, (২) অনিয়মিত সরবরাহ, (৩) পোকা-মাকড় এবং রোগবালাই প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণে দক্ষতার অভাব, (৪) গুণগত মানসম্পন্ন ফল উৎপাদনে উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি সম্পর্কে কৃষকদের জ্ঞানের অভাব, (৫) সংগ্রহকালীন এবং সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার অভার, (৬) মানসম্পন্ন প্যাকেজিং সামগ্রী ব্যবহার না করা, (৭) বিমানে প্রয়োজনীয় স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা না থাকা, (৮) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় অতিরিক্ত বিমান ভাড়া প্রদান, (৯) আধুনিক প্যাক-হাউজ এবং শীততাপনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার অভাব, (১০) বিমানের কার্গো স্পেসে শীততাপনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা না থাকা অন্যতম। উল্লেখিত সমস্যাবলি যথাযথভাবে সমাধানের মাধ্যমে অধিক পরিমাণে শাকসবজি ও ফল রপ্তানি করা সম্ভব।

শাকসবজি ও ফল রপ্তানির সম্ভাবনা

অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে সুনির্দিষ্টভাবে ধারণা করা যায় যে, ভবিষ্যতে বাংলাদেশি ফলের রপ্তানির সম্ভাবনা প্রচুর। পর্যাপ্ত সরবরাহ সাপেক্ষে ফলের গুণগত মান উন্নয়ন, ধারাবাহিকভাবে সরবরাহ নিশ্চিত করা, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় অনুকূল তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা রক্ষা, উন্নত প্যাকেজিং ব্যবহার এবং সর্বোপরি সুপারভাইজড এবং চুক্তিভিত্তিক চাষাবাদ নিশ্চিত করা গেলে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে বাংলাদেশি শাকসবজি ও ফলের রপ্তানি কয়েক গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক উচ্চমূল্যের বাজারের গতিধারা, বাজার চাহিদা এবং পণ্যের প্রবেশাধিকারের উপর ভিত্তি করে গুণগত মানসম্পন্ন প্রধান প্রধান শাকসবজি যেমন- বরবটি, চিচিঙ্গা, ঢেঁড়শ, বেগুন, কাঁকরোল, পটোল, কুমড়াজাতীয় সবজি ইত্যাদি এবং প্রধান প্রধান ফল যথা- আম, আনারস, কাঁঠাল, লেবুজাতীয় ফল (সাতকড়া, তৈকর, জারা লেবু, এলাচি লেবু), কুল, কলা, লিচু, পেয়ারার যথেষ্ট বাজার সম্ভাবনা বিদ্যমান। এ ছাড়াও প্রক্রিয়াজাতকরণের (হিমায়িত এবং টিনজাতকরণ) মাধ্যমে কিছু কিছু ফল যেমন- জলপাই, আনারস (টিনজাত), সাতকড়া, কাঁচা কাঁঠাল ও কাঁঠালের বিচি বাজারজাত করণের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদাসম্পন্ন বাংলাদেশি শাকসবজি ও ফলের অধিক বাজার সম্প্রসারণ, উচ্চমূল্যের বাজারে প্রবেশ, অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে শাকসবজি ও ফলের উন্নত জাত উদ্ভাবন, বছরব্যাপী বা দীর্ঘ সময়কালীন সংগ্রহোত্তর কার্যক্রম পরিচালনায় চলমান গবেষণা এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের বিকল্প নাই।

নবম অধ্যায়
কৃষি বিপণন

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে দেশের কৃষিপণ্য উৎপাদন কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বছর বছর জমির পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও খাদ্যশস্য উৎপাদনে দেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। উন্নয়নশীল বা উন্নত বিশ্বের যে কোনো দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পূর্বশর্ত হলো সময়োপযোগী ও বাস্তব বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ। সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে না পারলে অর্থাৎ কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে না পারলে উৎপাদন ধারা টিকিয়ে রাখা সম্ভবপর নয়। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে অর্থনীতিতে কৃষিপণ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার পরিপূরণ ও বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে কৃষিপণ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

কৃষি বিপণন

যে সব পণ্যসামগ্রী মূলত ভূমি, নদ-নদী, খামার ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন হয় তাকে কৃষিপণ্য বলে । তবে পশু বা বিভিন্ন প্রকার জীবজন্তুকেও কৃষিপণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই দেখা যায় যে, কৃষিপণ্য সামগ্রী বিভিন্ন প্রকৃতির ও ধরনের হতে পারে। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার কৃষিপণ্যের একটি তালিকা দেওয়া হলো-

১) বিভিন্ন ধরনের খাদ্যসামগ্রী। যেমন- ধান, গম, ভুট্টা, তেলবীজ, ফলমূল, শাকসবজি প্রভৃতি। ২) মৎস্যসম্পদ। ৩) পশু সম্পদ । যেমন- গরু, ভেড়া, ছাগল, মহিষ, উট ইত্যাদি। ৪) খামারে উৎপাদিত সামগ্রী । যেমন- দুধ, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি। ৫) অন্যান্য সামগ্রী । যেমন- পাট, চামড়া, তামাক ইত্যাদি।

বিপণন হচ্ছে মূলত সময়, স্থান ও মালিকানাজাতীয় উপযোগ সৃষ্টির কাজ। এ ধরনের চিন্তা থেকেই বিপণনকে পণ্যসামগ্রী বিতরণের কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ বিপণন হচ্ছে সে সকল ব্যবসায়িক কার্যক্রম, যা পণ্য ও সেবা উৎপাদক থেকে ভোক্তার নিকট সঠিক সময়ে সঠিক স্থানে, যথাযথ অবস্থায় এবং প্রত্যাশিত মূল্যে পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত।

কৃষি বিপণন হচ্ছে কোনো কৃষিপণ্য অথবা সেবা প্রারম্ভিক উৎপাদন হতে শুরু করে ভোক্তার হাতে পৌঁছানোর মধ্যবর্তী যাবতীয় ব্যবসায়িক কার্যাবলি সম্পাদন। সহজ কথায় বলা যায়, কোনো পণ্য উৎপাদনের পর উৎপাদকের কাছ থেকে ভোক্তার নিকট পণ্যসামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার সাথে যত প্রকার ব্যবসায়িক কার্যাবলি জড়িত আছে সবগুলোর সামগ্রিক রূপই হলো বিপণন ।

কৃষি বিপণনের কার্যাবলি শুধু উৎপাদকের কাছ থেকে চূড়ান্ত ভোক্তার কাছে কৃষিপণ্য পৌঁছে দেওয়ার মধ্যেই সীমিত নেই, বরং ঐসব কার্যাবলির সাথে জড়িত পক্ষগুলো যেমন- উৎপাদক, মধ্যস্থতাকারবারি ও ভোক্তাদের উপর কী প্রভাব ফেলছে তার সাথেও সম্পৃক্ত।

কৃষিপণ্য বিপণনের কার্যাবলি

কৃষিপণ্য উৎপাদনের পর থেকে তা ভোক্তার হাতে পৌঁছে দেওয়ার মধ্যবর্তী পর্যায়ে সম্পাদিত সকল কার্যই কৃষিপণ্য বিপণনের কার্যবলি বলে বিবেচিত হবে। কৃষিপণ্য উৎপাদনের পর তা ভোক্তার হাতে পৌঁছে দিতে গেলে অনেকগুলো কার্য সম্পাদন করতে হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়, পরিবহন, প্যাকেজিং, অর্থসংস্থান, সংরক্ষণ প্রভৃতি। ব্যাপক অর্থে কৃষিপণ্য বিপণনের কাজ শুরু হয় পণ্য উৎপাদনের আগেই এবং ভোক্তার হাতে পৌঁছে দেওয়ার পরও তার কাজ বাকি থেকে যায়। অর্থাৎ কৃষিপণ্য উৎপাদন শুরুর পূর্বেই এর বাজার, মূল্য, চাহিদা, বীজ ও উপকরণ সংগ্রহ ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন হয়, যা কৃষি বিপণনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এমনিভাবে কৃষি বিপণনের ক্ষেত্রে অনেক ধরনের কার্যাবলি জড়িত। কৃষিপণ্য বিপণনের কার্যাবলি বলতে যে সব কাজকে বোঝায় তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

ক) একত্রীকরণ (Assembling): বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীকে জড় করার নামই একত্রীকরণ। কৃষকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্রয়যোগ্য উৎপাদন ব্যবসায়ীরা ক্রয়ের মাধ্যমে এ কাজটি সম্পদান করে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ের গ্রাম্য বাজার থেকেই এ কাজটি শুরু হয়। অনেক সময় কৃষকের বাড়ির আঙিনা থেকেও কাজটি শুরু হয়। উৎপাদন মৌসুমে প্রাথমিক বাজারে পণ্যের জোগান দেখে বিপণনকারীরা কার্যকর সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

খ) মোড়কীকরণ (Packaging): পণ্য পরিবহন, সংরক্ষণ ও ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মোড়কীরণের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। যথাযথ মোড়কীকরণের উপর পণ্যমান সঠিক রাখা নির্ভর করে। আমাদের দেশে কৃষিপণ্যের বেলায় মোড়কীকরণের ব্যবস্থা অবৈজ্ঞানিক। এ কারণে ভোক্তা কাঙ্ক্ষিত মানে পণ্য পায় না। তবে বর্তমানে দেশে মোড়কীকরণে অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে।

গ) প্রক্রিয়াকরণ (Processing): কৃষিপণ্য উৎপাদনের পর বিপণনের জন্য নানা ধরনের প্রক্রিয়াকরণ কাজ জড়িত থাকে। পণ্যের প্রকৃতি ভেদে প্রক্রিয়াকরণ কাজও বিভিন্ন হয়। যেমন- ধানকে চালে রূপান্তর করতে হয়। গম, সরিষা, পাট ইত্যাদিকে পরিচ্ছন্নকরণ, শুষ্ককরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণপূর্বক ভোগযোগ্য করার প্রয়োজন হয়।

ঘ) সংরক্ষণ (Storing): কৃষিপণ্য মৌসুমভিত্তিক উৎপাদিত হয়। অথচ ভোক্তার চাহিদা থাকে বছরব্যাপী। এ ধরনের ভোক্তার চাহিদা পূরণের জন্য কৃষিপণ্যকে মজুত করে রাখা হয়। তবে পণ্যের প্রকৃতিগত পার্থক্যের কারণে সংরক্ষণ ব্যবস্থায়ও বিভিন্নতা দেখা যায়। যেমন- পাট যেভাবে সংরক্ষিত হয়, ফলমূলের বেলায় তা চলে না।

ঙ) পরিবহন (Transportation): কৃষিপণ্য উৎপাদিত হয় কৃষি খামারে, প্রধানত গ্রামাঞ্চলে। এসব পণ্যের উৎপাদন পরিমাণ কৃষকদের খামার আয়তনের উপর নির্ভরশীল। আর কৃষিপণ্যের চাহিদা প্রধানত দূরবর্তী শহরাঞ্চলে কিংবা শিল্পে বিরাজ করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারের উৎপাদনকে তাই চাহিদা স্থানে প্রেরণের জন্য পরিবহন একটি অনন্য কাজ হিসেবে বিবেচিত।

চ) পাইকারি ক্রয়-বিক্রয় (Whole selling): কৃষিপণ্য একত্রীকরণ ও বিতরণ প্রক্রিয়ায় বড় লটে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয়, যা পাইকারি ক্রয়-বিক্রয় নামে পরিচিত।

ছ) অর্থসংস্থান (Financing): কৃষিপণ্য উৎপাদনের পর তা কয়েক দফা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ভোক্তা বা ব্যবহারকারীর নিকট পৌঁছে। বেপারি, ফড়িয়া যারা ক্রয়-বিক্রয়ে জড়িত থাকে তাদের পুঁজির উপর বাজার অবস্থা নির্ভর করে। এ কারণে ব্যবসায়ীদের অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হয়।

জ) খুচরা ক্রয়-বিক্রয় (Retailing): কৃষিপণ্যের ভোক্তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে ক্রয় ও ভোগ করে থাকে। কিন্তু উৎপাদক ও ভোক্তার মাঝে থাকে বিস্তর ব্যবধান। এ ব্যবধানকে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে জন্ম নিয়েছে নানা নামের বৃহৎ কারবারি। এরা বড় বড় লটে ক্রয়-বিক্রয় করে। ফলে ভোক্তার হাতে পণ্য পৌঁছানোর জন্য খুচরা ক্রয়-বিক্রয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঝ) বাজার তথ্য (Market Information): আমরা কথায় কথায় বলতে শুনি এবারে ফসল ভালো হয়েছে। অর্থাৎ উৎপাদন আশাব্যঞ্জক। এটি এক ধরনের বাজার তথ্য। এ ধরনের তথ্য পণ্যমূল্য, পণ্য প্রাপ্তি ইত্যাদিকে প্রভাবিত করে। তবে বিপণনের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা আরো গভীরভাবে বিষয়টিকে বিবেচনায় আনে। যেমন- কখন ক্রয় করা লাভজনক হবে। কখন মজুত করা উত্তম হিসেবে বিবেচিত এবং কী পরিমাণে, কত মূল্যে পণ্য বিক্রি করা লাভজনক ইত্যাদি। এ সকল অবস্থা ঢেলে সাজানোর ক্ষেত্রে বিপণনকারীকে অতন্দ্র প্রহরীর মতো বাজার তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

ঞ) পণ্য সিদ্ধান্ত (Product Decision): কৃষি খামারে একই সময়ে নানা ধরনের ও জাতের পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব। তাই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, কোন্ পণ্য উৎপাদন করা হবে। এ ক্ষেত্রে উৎপাদককে পণ্যের চাহিদা, ভবিষ্যৎ মূল্য, উৎপাদনের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাছাড়া, খামারে আয়তন পণ্য উৎপাদন সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে থাকে।

ট) প্রক্রিয়াকরণ উদ্ভাবন (Process Innovation): যে কোনো পণ্যের বিচিত্র ব্যবহার পণ্যের উপযোগ ও চাহিদাকে প্রভাবিত করে। কৃষিপণ্যের বেলায় তা আরও বেশি প্রযোজ্য। যেমন- ডিমের বিচিত্র ব্যবহারের কারণে এ পণ্যের চাহিদা সমাদৃত। ফলে কৃষি বিপণনকারী পণ্যের বিচিত্র ব্যবহার উদ্ভাবনের মাধ্যমে বাজার সম্প্রসারণ করতে পারে। এ সকল প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের মধ্যেই বিপণনকারীর দক্ষতা ও সফলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল।

ঠ) বিক্রয়োত্তর সেবা (After Sales Service): আধুনিক বিপণন ব্যবস্থায় একজন বিপণনকারী শুধু তার পণ্য বিক্রয় করে তৃপ্ত হয় না। ভোক্তাকে তৃপ্ত রাখা তার অন্যতম লক্ষ্য। ভোক্তার সন্তুষ্টি বিধানের মাধ্যমে সে তার পণ্যের বাজার চাহিদা বা অংশ ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে চায়। এ জন্য আধুনিক বিপণন ব্যবস্থায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

কৃষিপণ্যের বিপণন চ্যানেল

উৎপাদক এবং ভোক্তা এ দুইপক্ষের মধ্যে যারা যোগসূত্র স্থাপন করে তাদের বলা হয় মধ্যস্থকারবারী। উৎপাদকের নিকট থেকে কোনো পণ্য ক্রয় করে ভোক্তার নিকট তারা সেই পণ্য বিক্রয় করে। উৎপাদক এবং ভোক্তাকে যদি আমরা একটি সড়কের দুই প্রান্ত মনে করি, তবে এক প্রান্ত থেকে একটি পণ্য অপর প্রান্তে পৌঁছাতে মধ্যস্থকারবারি তৎপর থাকে। যে পথ ধরে পণ্যসামগ্রী উৎপাদকের নিকট থেকে ভোক্তার নিকট পৌঁছে, পণ্য প্রবাহের সেই পথই হলো বণ্টন প্রণালি বা বিপণন চ্যানেল।

কৃষিজাত পণ্য বণ্টনের প্রণালিসমূহ

কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনকারীর কাছ থেকে ভোক্তার কাছে পৌঁছানোর উপায় বা পদ্ধতিকে আমরা নিম্নলিখিত চারটি উপায়ে প্রকাশ করতে পারি-

১) সরাসরি বিক্রয় ২) খুচরা বিক্রেতার মাধ্যমে বিক্রয় ৩) পাইকারের মাধ্যমে বিক্রয় ৪) প্রতিনিধির মাধ্যমে বিক্রয় ।

নিম্নে কৃষিপণ্য বিপণনের পদ্ধতিসমূহ বিশদভাবে আলোচনা করা হলো-

- **সরাসরি বিক্রয়**

  এ পদ্ধতিতে কৃষক বা উৎপাদনকারী তাদের উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে স্থানীয় বাজারে ভোক্তাদের কাছে বিক্রি করে থাকে। বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জে অবস্থিত বাজারগুলোতে উৎপাদকরা তাদের উৎপাদিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিমাণ কৃষিজাত পণ্য এভাবেই বিক্রি করে থাকে । দুধ, চাল, শাকসবজি, ডাল, ফলমূল ইত্যাদি এভাবেই বিক্রি হয়ে থাকে।

- **খুচরা বিক্রেতার মাধ্যমে বিক্রয়**

  এখানে উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে একটি মাত্র চ্যানেল থাকে। এ পদ্ধতিতে খুচরা কারবারি উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে এসে দাঁড়ায়। এখানে উৎপাদকরা তাদের পণ্য খুচরা কারবারিদের কাছে বিক্রি করে দেয় (গ্রামের বাজারে এরা ফড়িয়া হিসেবে পরিচিত) এবং তারা আবার ভোক্তাদের কাছে বিক্রি করে। সাধারণত হাটের দিন বা বাজারের দিন এরা কৃষকদের কাছ থেকে বেশি করে কৃষিজাত পণ্য কিনে নেয় এবং সপ্তাহের অন্যান্য দিন তা ভোক্তাদের কাছে বিক্রয় করে। চাল, তরিতরকারি, ডাল প্রভৃতি সাধারণত এভাবে বিক্রি করা হয়ে থাকে।

- **পাইকারের মাধ্যমে বিক্রয়**

  আমাদের দেশের কৃষিজাত পণ্যের একটি বড় অংশই বিক্রি হয় পাইকারি বিক্রেতাদের মাধ্যমে। এখানে উৎপাদকরা পাইকারদের নিয়োজিত দালাল বা বেপারির কাছে তাদের পণ্য বিক্রি করে। পাইকাররা স্থানীয় বাজার থেকে এভাবে সংগৃহীত কৃষিজাত পণ্য একত্রিত করে তা শহরের খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে

বিক্রি করে এবং সর্বশেষ খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেই ভোক্তারা পণ্য কিনে নেয়। শহরের অধিকাংশ কাঁচামাল, তরিতরকারি, মাছ, ফলমূল প্রভৃতি এভাবেই বিক্রি হয়ে থাকে। অবশ্য কোনো কোনো পাইকার খুচরা কারবারিদের কাছে পণ্য বিক্রি না করে তা সেকেন্ডারি বা টার্মিনাল মার্কেটে অথবা প্রক্রিয়াকারীর কাছে বিক্রি করতে পারে।

➢ **প্রতিনিধির মাধ্যমে বিক্রয়**

উৎপাদনকারী কখনো কখনো কোনো গুরুত্বপুর্ণ নগর ও বন্দরে কোনো প্রতিষ্ঠানকে তাদের এজেন্ট বা প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারে যার মাধ্যমে সে তার পণ্য বিক্রি করে থাকে। এখানে প্রতিনিধির কাছ থেকে পাইকার বা খুচরা কারবারিরা পণ্য কিনে নেয় এবং ভোক্তারা এদের কাছ থেকেই পণ্য পেয়ে থাকে। বিশেষ করে প্রসেস করা খাদ্যদ্রব্য বিক্রির ক্ষেত্রে এরূপ প্রতিনিধি নিয়োগ করতে দেখা যায়। যেমন- আহমেদ ফুড প্রোডাক্টস্ কোম্পানি তাদের প্রস্তুতকৃত জ্যাম, জেলি প্রভৃতি কোনো এজেন্টের মাধ্যমে বিক্রি করতে পারে।

কৃষিপণ্যের বিদ্যমান মার্কেটিং চ্যানেল ও মধ্যস্থকারবারি

- **ধাপহীন চ্যানেল :** উৎপাদক ⟶ ভোক্তা
- **একধাপ চ্যানেল :** উৎপাদক ⟶ খুচরা বিক্রেতা ⟶ ভোক্তা
- **দ্বিধাপ চ্যানেল :** উৎপাদক ⟶ পাইকারি বিক্রেতা ⟶ খুচরা বিক্রেতা ⟶ ভোক্তা
- **ত্রিধাপ চ্যানেল :** উৎপাদক ⟶ প্রতিনিধি ⟶ পাইকারি বিক্রেতা ⟶ খুচরা বিক্রেতা ⟶ ভোক্তা

কৃষিপণ্য বিপণনের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

আমাদের দেশে কৃষি বিপণন ব্যবস্থায় যুগ যুগ ধরে বহুবিধ সমস্যা বিদ্যমান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমস্যার তীব্রতা ও আঙ্গিক পরিবর্তিত হলেও মূলত এ আধুনিক বিশ্বে বাংলাদেশের কৃষিপণ্য বিপণন সমস্যা এখনও কৃষির অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কৃষিপণ্য বিপণনে এ ধরনের কিছু চ্যালেঞ্জ বা সমস্যা এবং সম্ভাবনা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

কৃষিপণ্য বিপণনের চ্যালেঞ্জসমূহ

কৃষক পর্যায়ে সমস্যা

মৌসুমে ফসলের নিম্নমূল্য ফসল গুদামজাতকরণ বা সংরক্ষণে সমস্যা, অপর্যাপ্ত ও অদক্ষ বাজার ব্যবস্থা, হাট বাজারে বেশি হারে টোল/খাজনা আদায়, শস্য কর্তনোত্তর প্রযুক্তি জ্ঞান, গ্রেডিং, মান নির্ধারণ, মোড়কীকরণের (প্যাকিং) অভাব, শস্য বিমা ও ঋণ সুবিধার অভাব, অপ্রয়োজনীয় সংখ্যক মধ্যস্বত্বভোগীর দৌরাত্ম, শস্য পরিবহনজনিত অসুবিধা, কৃষক সংগঠনের অভাব, অপর্যাপ্ত বাজার তথ্য ইত্যাদি।

ব্যবসায়ী পর্যায়ে সমস্যা

ফসলের অপর্যাপ্ত জোগান, পরিবহনের অসুবিধা ও অধিক ব্যয়, বিপণন ঋণের অভাব, বাকিতে পণ্য বিক্রয়ে অসুবিধা, অস্থিতিশীল মূল্য, গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণের অসুবিধা, শীতল ব্যবস্থা সংবলিত পরিবহন ব্যবস্থার অভাব ইত্যাদি।

ভোক্তা পর্যায়ে সমস্যা

মৌসুম শেষে কৃষিপণ্যের উচ্চমূল্য এবং বাজার থেকে বাজারে মূল্যের তারতম্য, অস্থিতিশীল সরবরাহ, গুণগত মানসম্পন্ন পণ্যের অভাব ও ভেজাল পণ্য, মোড়কীকৃত পণ্যের অভাব, সময়মতো এবং উপযুক্ত মাধ্যমে বাজার তথ্যের অভাব, বিক্রেতা কর্তৃক ওজনে কারচুপিসহ নানাবিধ অসাধু উপায় অবলম্বন, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত বাজারের অপ্রতুলতা ইত্যাদি।

প্রক্রিয়াজাতকরণ পর্যায়ে সমস্যা

গুণগত মানসম্পন্ন কাঁচামালের অনিয়মিত ও অপ্রতুল সরবরাহ, ব্যাংকঋণের অপর্যাপ্ততা ও ঋণ প্রাপ্তিতে অসুবিধা, ডালকলাই ও তৈলবীজ প্রক্রিয়াকরণে লাগসই প্রযুক্তির অভাব, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার তথ্যের অভাব, মান নিয়ন্ত্রণ সুবিধার অভাব ইত্যাদি।

রপ্তানিকারকের সমস্যা

চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের অপ্রতুলতা, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মোড়কীকরণ, পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভাব, রপ্তানি বাজার সম্পর্কিত তথ্যের অভাব, কার্গো সুবিধার অপ্রতুলতা ও উচ্চ কার্গো খরচ, রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য প্রাপ্তি অসুবিধা ও সরকারি নীতি সংক্রান্ত সমস্যা ইত্যাদি।

কৃষিপণ্য বিপণনের সম্ভাবনা

- বাংলাদেশের জমি খুবই উর্বর। এ দেশে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে সত্য। তবে নতুন নতুন উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবিত হচ্ছে। কাজেই উর্বর জমিতে কৃষকরা জমির পরিমাণ না বাড়িয়েই ভালো চাষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে সামগ্রিক উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হচ্ছে। ফলে সামগ্রিক কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখছে।
- কৃষকের ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে ঋণসুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রেও কৃষকগণ সরকারি ও এনজিও পর্যায়ে অনেক প্রশিক্ষণ ও ঋণ সুবিধা পাচ্ছে। ফলে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের প্রসার ঘটছে।
- প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধিত হওয়ায় প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অনেক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে উঠছে। কাজেই তাদের পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনেক বিকল্প পন্থা থাকায় তারা দেখেশুনে সুযোগ-সুবিধামতো পণ্য বিক্রয় করতে পারছে। অনেক প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে উঠায় পণ্য

বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে করে তাদের মূলধন বেশি বেশি হাতবদল হওয়ায় মোট লাভ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- প্রক্রিয়াজাতকারীর জন্য সম্ভাবনা হচ্ছে একটি বিশাল অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং জনগণের আয় বাড়ায় তাদের ভোগের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া জনগণের রুচির পরিবর্তন আসায় এবং সুপার স্টোরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রক্রিয়াজাতকৃত এবং প্যাকেটজাতকৃত পণ্যের চাহিদা বাড়ছে (যেমন- প্রক্রিয়াজাতকৃত মসলা)।
- মোড়কীকরণ প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধিত হওয়ায় প্রক্রিয়াজাতকৃত সামগ্রীর সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে করে প্রক্রিয়াজাত দক্ষতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সামগ্রিক বিপণন দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- রপ্তানি ক্ষেত্রেও প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্য ও ফলমূলের একটি বিশাল বাজার আছে। কাজেই এ জাতীয় ফসলের রপ্তানি বৃদ্ধি করে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়নে করণীয়

ভোক্তার হাতে সহজে পণ্য পৌঁছে দিতে বিপণন ব্যয় হ্রাস বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি। বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়নে করণীয় প্রধান কাজসমূহ হলো:

- কৃষিপণ্য খামার থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বাজারসমূহে যাতে সহজে স্বল্প ব্যয়ে প্রেরণ করা যায় সেজন্য পল্লী এলাকায় পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করতে হবে। গ্রামের লোকজন সড়ক ও নৌ-পরিবহনের উপর খুব বেশি নির্ভরশীল বলে এ দুই প্রকার পরিবহনের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে এদের উন্নয়নের জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালানো উচিত। রাস্তাঘাটসমূহ এমনভাবে তৈরি করা উচিত যাতে গ্রামের সাথে মফস্বল শহরগুলোর সহজ যোগাযোগ স্থাপিত হতে পারে।
- গ্রাম পর্যায়ে বিজ্ঞানসম্মত সংরক্ষণ সুবিধার সম্প্রসারণ ঘটলে পণ্যের অপচয় হ্রাস পাবে। আর পণ্যাগার রসিদের ভিত্তিতে কৃষকদের ঋণ সরবরাহের সুবিধা প্রদান করলে তারা মৌসুমে স্বল্প মূল্যে পণ্য বিক্রয় না করে গুদামজাত করে রাখতে সক্ষম হবে। ফলে বিপণন ব্যবস্থা দক্ষতর হবে।
- কৃষিপণ্যের বিপণনে অগণিত সংখ্যক মধ্যস্বত্বভোগীর তৎপরতা হ্রাস করে বিপণনে দক্ষতা আনয়নের উদ্দেশ্যে সমবায়ভিত্তিক বিপণন দল অধিক সংখ্যায় গঠন করে উৎপাদকদের সংগঠিত করতে হবে এবং দলগত বিপণনের মাধ্যমে কৃষকদের সাথে ব্যবহারকারীদের বা ভোক্তার বিপণন যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে।
- যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি হলে কৃষকরা দূরবর্তী বাণিজ্য কেন্দ্রে গিয়ে পণ্য পাইকারি বাজারে বিক্রি করতে সক্ষম হবে বলে তখনও কয়েক ধরনের মধ্যস্বত্বভোগীর বণ্টন প্রণালি থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হবে।
- উৎপাদক এবং ব্যবসায়ী উভয় শ্রেণির স্বার্থেই সমগ্র দেশব্যাপী একই প্রকার/মানের ভিত্তিতে পণ্য পর্যায়িতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ওজন ও পরিমাপে ব্যত্যয় ঘটিয়ে ব্যবসায়ীরা কৃষকদের যাতে প্রতারণা করতে না পারে সেজন্য স্ট্যান্ডার্ড ওজন ও পরিমাপ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে তা বাস্তবায়নের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। সারা দেশে মেট্রিক পদ্ধতি বাধ্যতামূলকভাবে প্রবর্তন করে ওজনে কারচুপি নিরসন করা অনেকটা সম্ভব।

- মধ্যস্থকারবারি ও ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক উৎপাদক-বিক্রেতাদের নিকট থেকে অননুমোদিত মার্কেট চার্জ ও অতিরিক্ত টোল আদায়সহ অবৈধভাবে বিভিন্ন প্রকার বাট্টা বা এলাউন্স গ্রহণ করার প্রথা সরকারকে কঠোর হস্তে দমন করতে হবে।
- কৃষকদের নিয়মিতভাবে বাজার তথ্য সরবরাহের জন্য বাজার সংবাদ কর্মসূচি ব্যাপক আকারে গ্রহণ করতে হবে এবং বেশি সংখ্যক কৃষিপণ্য সম্পর্কে যাতে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা যায় সে ব্যাপারে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে যত্নবান হতে হবে।
- কৃষক ও ব্যবসায়ীদের কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে দেশ ও বিদেশের সময়োপযোগী বাজার তথ্য প্রদান।

দশম অধ্যায়
কৃষিবিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা পরিচিতি

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে অবদান রাখছে এমন কয়েকটি আন্তজার্তিক প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো-

১. জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (Food and Agricultural Organization of the United Nations) ১৪ অক্টোবর ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থাটি FAO নামে পরিচিত এবং এর সদর দপ্তর ইতালির রাজধানী রোমে অবস্থিত। সংস্থাটির প্রধান উদ্দেশ্য:

- বিশ্বের খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- উন্নত জাতের বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা করা;
- খাদ্য ও কৃষিপণ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন ও বণ্টন ব্যবস্থা উন্নয়ন;
- বালাই-এর আক্রমণ থেকে শস্যকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা;
- বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নযন করা ও প্রয়োজনীয় পুষ্টির সরবরাহ বৃদ্ধি করা;
- কৃষি উন্নয়নে সরকারকে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা।

স্বাধীনতার দুই বছর পর ১২ নভেম্বর ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে FAO-এ যোগদান করে। তখন থেকেই FAO-বাংলাদেশকে মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, বনসহ কৃষি খাতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নে সহযোগিতা করে আসছে। FAO-প্রতিনিধি অফিস ঢাকায় ১৯৭৮ সালে স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে FAO-র সহযোগিতা আরও জোরদার হয়।

২. আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি)

আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (International Rice Research Institute-IRRI) ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ড (Ford) এবং রকফেলার ফাউন্ডেশন (Rockefeller Foundation) এর সহায়তায় ফিলিপাইনে স্থাপিত হয়।

৩. আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র (CIMMYT)

আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র (সিমিট) একটি অবাণিজ্যিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা। এটি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত ও দারিদ্র্য দূরীকরণে ভুট্টা ও গমের আবাদ বাড়ানোর লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী নানা সহযোগী সংস্থার সাথে একত্রে কাজ করে।

৪. ওয়ার্ল্ডফিশ (WorldFish)

ওয়ার্ল্ডফিশ একটি আন্তর্জাতিক অলাভজনক গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান যা মৎস্য সম্পদ ও মাছ চাষের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত পৃথিবী গড়তে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে ১৯৮৯ সালে ওয়ার্ল্ডফিশ-এর দক্ষিণ এশিয়া অফিস স্থাপনের পর থেকে বাংলাদেশি ও দক্ষিণ এশীয় মানুষ উপকৃত হচ্ছে।

৫. আন্তর্জাতিক আলু কেন্দ্র (সিআইপি)

আন্তর্জাতিক আলু কেন্দ্র, স্প্যানিশ ভাষায় "সিআইপি" নামে পরিচিত, ১৯৭১ সালে মূল ও কন্দ (আলু ও মিষ্টিআলু) উন্নয়নের জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে হয় যা বিশ্বের ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয় সমস্যাসমূহের টেকসই সমাধানকল্পে কাজ করে যাচ্ছে। পেরুর লিমায় অবস্থিত সদর দপ্তরের পাশাপাশি এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার ২০টি উন্নয়নশীল দেশে সিআইপি'র অফিস আছে।

বাংলাদেশে সিআইপি আলু ও মিষ্টিআলুর জাত সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ১৯৮০ সাল থেকে কাজ করছে।

৬. ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট:

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা যেমন- খাদ্য উৎপাদন ও এর ব্যবহারের উপর নির্ভর করে তেমনি যেসব নীতিমালা খামার থেকে শুরু করে খাবার টেবিল পর্যন্ত পুরো খাদ্য ব্যবস্থায় প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে সেগুলোর উপরও নির্ভরশীল। International Food Policy Research Institute (IFPRI): (IFPRI) ১৯৮৮ সাল থেকে বাংলাদেশে গবেষণা পরিচালনা, নীতিমালা বিষয়ক সহায়তা প্রদান এবং অংশীদারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড নিয়ে সক্রিয় রয়েছে।

সমাপ্ত

২০১৯
শিক্ষাবর্ষ
সম্পূরক কৃষিশিক্ষা
৯ম-১০ম

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন– দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে
নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোল
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিশ্রম কখনও নিষ্ফল হয় না

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক সংকলিত এবং
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত